অনীক

জুলাই ২০১৩

বর্ষ ৫০ ❑ সংখ্যা ১

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় ❑ ১

ঘটনাপ্রবাহ

স্নোডেন কাহিনী ❑ মিতা দত্ত ❑ ২

ব্রাজিলে বিদ্রোহ ❑ সুমিত্রণ ❑ ৩

উত্তরাখন্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ❑ সমু ❑ ৪

বিষয় : সুন্দরবন

বিষয় সুন্দরবন ❑ তুষার কাঞ্জিলাল ❑ ৯

সুন্দরবন : ভৌগোলিক সংকট ❑ কল্যাণ রুদ্র ❑ ১৭

সুন্দরবন ও সুন্দরবনের মানুষ ❑ অরিজিৎ ❑ ১৯

সুন্দরবন: এক অন্য দুনিয়া ❑ পার্থসারথি ❑ ২৫

প্রবন্ধ

অনীক ও দীপংকর চক্রবর্তী : অর্ধশতক পরিক্রমা ❑ শুভাশিস ❑ ৩২

কবিতা

কামদুনিকে সেলাম ❑ অচিন্ত্য সুরাল ❑ ৮

আজকের ছড়া ❑ সৃজন সেন ❑ ৮

মুঠো পাকানো ছড়া ❑ মৃন্ময় চক্রবর্তী ❑ ৮

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :

প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯

দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা

ই-মেল : aneek.bm@gmail.com

ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**

সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

অনীক : পঞ্চাশে পা

অনীক পঞ্চাশ বছরে পা দিলো।

একটি পত্রিকার পক্ষে, একটি রাজনৈতিক পত্রিকার পক্ষে, সময়টা বড়ো কম নয়। বিশেষত সে সময়টা যদি হয় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ৬০-এর দশক, বিপ্লব ও নিপীড়নের, এবং নতুন স্বপ্ন দেখার ৭০-এর দশক, ফলিত বামপন্থার পতনের, আর বামফ্রন্টের শাসনের ৮০-র দশক, বিশ্বায়নের ও হতাশার ৯০-এর দশক, আর শোষণ-নিপীড়ন বাঁধনছাড়া হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবাদের-প্রতিরোধের নতুন শতক। এই সময়ের মধ্যে ঘটেছে দুনিয়ার দেশে দেশে মার্কিন আগ্রাসন ও জনগণের প্রতিরোধে তার পিছিয়ে যাবার ঘটনা। দেশে দেশে নতুন ধারার বিপ্লব প্রচেষ্টা, যাদের প্রেরণা ছিলেন মাও। সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে মাও-পরবর্তী চীনের 'বিরাট বিপরীত যাত্রা'। মার্কিন-সোভিয়েত ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রবলতম সময় থেকে সোভিয়েতের ভেঙে পড়া এবং একমেরু বিশ্ব। মৌলবাদের প্রবল হয়ে ওঠা। আর বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির দুর্বল হয়ে পড়া। 'বামপন্থী' বলে কথিত একটি অংশ সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী থাকলেও মতাদর্শগত শূন্যতার কারণে তাদের কাছে জনগণের কিছু পাওয়ার নেই। আর বিপ্লবপন্থী যে অংশটির সঙ্গে *অনীক*-এর আত্মিক ও রাজনৈতিক যোগ, শতধা-বিচ্ছিন্ন সেই ধারাটি রাজনীতিগত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে শক্তি খুইয়েছে। আর একদিকে মূলত নকশালপন্থী আন্দোলনের ভুলভ্রান্তিগুলি সহ নতুন করে কাজ করতে নেমে মাওবাদীরা সাংগঠনিক দিক দিয়ে কিছুটা শক্তির প্রকাশ দেখালেও অতীতের থেকে শিক্ষা না নিয়ে তারা অতীতের রাজনৈতিক ভুলগুলির অনেকটাই পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন— যদিও আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে কেটেছে *অনীক*-এর পাঁচটি দশক। এই দীর্ঘ সময় ধরে *অনীক* চেষ্টা করে গেছে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচার করতে, রাজনীতির মূল কথা জনগণের হাতে ক্ষমতা আনার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট না হতে। স্বাভাবিকভাবেই একটি পত্রিকা হিসাবে এখানে সরাসরি তার কিছু করার না থাকলেও চলমান আন্দোলনকে শক্তি যোগানোর কাজটি করতে চেয়ে এই পত্রিকাটি। তাতে আমরা কতটা সফল হয়েছি সেটা বলবেন পাঠকরা, আর বলবে ভাবীকাল।

আর এই পুরো সময়টা জুড়ে *অনীক*-এর মূল নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন দীপংকর চক্রবর্তী, যাঁকে ছাড়া *অনীক*-এর এই দীর্ঘ যাত্রা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য, ৫০ বছরের পুর্তিতে তিনি আর আমাদের পাশে নেই। কিন্তু যাওয়ার আগে, বামপন্থী রাজনীতি, মানবাধিকার, বিপ্লবী মতাদর্শগত সংগ্রামের পরিসরে *অনীক*-কে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। যে সমাজবীক্ষার দ্বারা *অনীক* পরিচালিত, সেই বীক্ষা স্পর্শ করেছে সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সামাজিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলিকেও।

পঞ্চাশে পা দিয়ে *অনীক* ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় তার পাঠকদের। খুব খারাপ সময়ে যখন ক্লান্তি বা অবসাদ এসেছে, কোনো এক পাঠকের চিঠি বা ফোন আমাদের নতুন করে প্রাণ দিয়েছে, আরো দায়বদ্ধ করে তুলেছে।

এই দীর্ঘ সময়ে *অনীক* অনেক বন্ধুর সঙ্গে পথ চলেছে— লেখক, কর্মী ও প্রেসকর্মী— এদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তবে বিশেষ করে পিবিএস-এর সাথীদের কথা উল্লেখ না করলে বোধহয় অপরাধ হবে।

আজ দেশ এক কঠিন সময়ে। ভারত দেশটিকে মার্কিন কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার, দেশের সব সম্পদ বহুজাতিকদের কাছে প্রায় বিনামূল্যে বেচে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে এদেশের সদর দপ্তরে। মানুষ অবশ্য ভুল করেননি, দেশকে বেচে দেওয়ার প্রতিটি চক্রান্তের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু, অভাব কাণ্ডারীর। পথ-প্রদর্শকের। ফলে আগামীকাল কী ঘটবে, তা অজানা। যাঁরা সাম্য ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, আজ তাই তাদের অগ্নিপরীক্ষা। *অনীক* তাদের দলেই আছে, পথ খোঁজার পথে।

ঘটনা প্রবাহ

স্নোডেন কাহিনী

মাত্র কয়েকদিন আগে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের বিমানকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ও পর্তুগাল, তাদের দেশে নামতে দেয়নি, বা তাদের আকাশপথ ব্যবহার করতে দেয়নি। বলেছে, তাদের দেশে নামলে বিমানটিকে সার্চ করা হবে। বিমানটিকে শেষপর্যন্ত যাত্রাপথ পাল্টে অন্যত্র অবতরণ করতে হয়। প্রোটোকল ভেঙ্গে একটি সার্বভৌম দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এরকম ব্যবহার কেন করা হলো? করা হলো, কারণ মার্কিন দেশের মনে হয়েছে এডওয়ার্ড স্নোডেন নামক এক ব্যক্তি সেই বিমানে থাকতে পারে (সেই সন্দেহ অবশ্য অসত্য প্রমাণ হয়েছে)। আর মার্কিন চাপে ইউরোপের দেশগুলির মাথা নত করা নতুন কিছু নয়।

কে এই স্নোডেন? কোনও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী, খুন-ডাকাতি-রাহাজানির সর্দার, বা কোনও ড্রাগ মাফিয়া শিরোমণি? আর তার সঙ্গে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের সম্পর্কই বা কি?

শেষ প্রশ্নটার উত্তরটা সহজ। মার্কিন দেশের জাতীয় সুরক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন কর্মী স্নোডেন ঐ সংস্থা কর্তৃক দেশের ভেতরে ও বাইরে গুপ্তচরবৃত্তির খবর প্রকাশ করে সে দেশ ছাড়েন। তারপর তিনি নানা দেশের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। ভারত থেকে শুরু করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তা দিতে রাজি হয় নি। তিনি তখন আশ্রয় নেন রাশিয়ার বিমানবন্দরের ট্রানজিট লাউঞ্জে। আর বলিভিয়ার বিমানটি আসছিল রাশিয়ার বিমানবন্দর থেকে। সম্পর্ক এইটুকু।

স্নোডেনের ওপর আমেরিকার এত ক্রোধের কারণ কী? কারণ এই যে তিনি সর্বসমক্ষে এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মার্কিন সরকার ও ব্রিটিশ সরকার নিজের দেশের লোকের ওপর এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলির ওপর বেআইনি গুপ্তচরবৃত্তি চালাচ্ছে। তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন PRISM-এর কথা। প্রোটেক্ট আমেরিকা অ্যাক্ট অফ ২০০৭ আইনবলে ২০০৭ সাল থেকে মার্কিন সুরক্ষা দপ্তর এই গোপন ইলেকট্রনিক প্রোগ্রামটি চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের নানান রাজনৈতিক ঘটনার পেছনে বামপন্থীরা *সিয়া* বা মার্কিন চক্রান্তের কথা বলে থাকেন। স্নোডেন প্রকাশ করে দিয়েছেন যে সেই অভিযোগ দিনের আলোর মতো সত্যি।

স্নোডেন কাজ করতেন এনএসএ-র সুরক্ষা বিষয়ে, কম্পুটার-বিষয়ক সুরক্ষা। করতে করতে তিনি যখন জানতে পারেন এই বিশাল গুপ্তচরবৃত্তির কথা, সেটা তিনি জনসমক্ষে আনার সিদ্ধান্ত নেন এবং দুজন প্রখ্যাত সাংবাদিককে ব্যাপারটা জানান। এর ফলে তিনি আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পলাতক জীবন যাপন করছেন। যদিও মার্কিন গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের অনেকেই তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন। উইকিলিক্স-খ্যাত জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জ (তিনিও গণতন্ত্রের পীঠস্থান আমেরিকা থেকে পলাতক— এখন উরুগুয়েতে) থেকে নোয়াম চমস্কি বা পেন্টাগন পেপার্স খ্যাত এল্সবার্গ বলেছেন, তিনি একটা ভালো কাজ করেছেন। উই দি পিপ্ল নামে একটি সংস্থা তাঁর পক্ষে ১ লক্ষ মানুষের সমর্থন যোগাড় করেছে— যারা বলছেন যে তাঁকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

ব্রিটিশ সরকারের বিদেশ মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে তাঁদের সরকার এই গুপ্তচরবৃত্তি করে থাকে, এবং সে কাজে মার্কিন দেশের দোসর।

জার্মানি ও ফ্রান্সের নেতারা বলেছেন যে এই ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি ‘মেনে নেওয়া যায় না’। তাঁদের দাবি, মার্কিন সরকার যেন অবিলম্বে এ কাজ বন্ধ করে। ইউরোপীয় জাস্টিস কমিশনও মার্কিন দেশের কাছে এর ব্যাখ্যা দাবি করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও মানুষ তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। হংকংয়ে মানুষ স্নোডেনের পক্ষে মিছিল-মিটিং করে সমর্থন জানিয়েছেন (স্নোডেন হংকংয়ে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন)। উত্তর কোরিয়া আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

স্নোডেনের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে মার্কিন গুপ্তচরবৃত্তির নিরিখে প্রথম স্থানে আছে স্বভাবতই ইরান, দ্বিতীয় স্থানে পাকিস্তান, আর ভারত দখল করে আছে পঞ্চম স্থান। ভারত তো আমেরিকার শত্রু দেশ নয়, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার। তা সত্ত্বেও ভারতের ওপর এতটা নজরদারি! লক্ষণীয় যে উপমহাদেশের দুটি প্রধান দেশ নজরদারির তালিকার প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে পড়ছে। এটা নিশ্চয় কাকতালীয় নয়। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এর পেছনে আছে এই উপমহাদেশের উপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর অপপ্রয়াস। অথচ আশ্চর্য, ভারত এখনও সরকারিভাবে কোনোরকম আপত্তি জানায় নি।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ‘প্রজেক্ট ফর এ নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি’র কথা। ১৯৯৭ সালে বুশ প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আমেরিকার কট্টর রক্ষণশীল রাজনীতিকরা এই নীতির কথা বলেছিল— নতুন শতকে সব কিছুকে হতে হবে আমেরিকার নীতির অনুসারী, মার্কিন স্বার্থ অনুসারী।

আজকের ইন্টারনেটের যুগে তথ্য গোপন রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করাই শুধু নয়, তথ্য পরিবর্তন করে দেওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। সেকারণে এই ক্ষেত্রে বিদেশি গুপ্তচরবৃত্তি দেশগুলির ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। ডলারের জোর, প্রযুক্তির জোর স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের গুপ্তচরবৃত্তিতে মার্কিন দেশকে বিশেষ পারদর্শী করে তোলে।

অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, কম্পুটারের তথ্যাদির সুরক্ষার ব্যাপারে এদেশে গাফিলতির শেষ নেই। একে তো দেশীয় প্রযুক্তি বা দেশীয় হার্ডওয়ার-সফ্টওয়ারের বদলে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে কাজে লাগানো হয় গুরুত্বপূর্ণ সব সরকারি ক্ষেত্রে। তারপর আবার এখন শুরু হয়েছে 'আধার' প্রকল্প। এতে দেশের প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য থাকবে। তাতে কাজ করছে মার্কিন সহ নানা বিদেশি সংস্থা। মার্কিন আইন অনুসারে আবার সেদেশের সরকার চাইলে প্রতিটি কোম্পানি সরকারকে তার কাছে থাকা সব তথ্য দিতে বাধ্য।

ভারতের ওপর মার্কিন এই শ্যেনদৃষ্টি এদেশের ওপর বহুজাতিকদের আক্রমণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বলতেই হয় যে দেশের আকাশে এখন ঘন কালো মেঘের অশুভ ছায়া।

সংযোজন: কালো মেঘের পাশে বিদ্যুতের রেখাও আছে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের এই অপমানের বিরুদ্ধে একটি সভায় জড়ো হয়ে লাতিন আমেরিকার নানা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা এর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। আর তার পর ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া ও নিকারাগুয়া স্নোডেনকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজি বলে ঘোষণা করেছেন। মার্কিন দেশের নাকের ডগায় লাতিন আমেরিকার দেশগুলির এরকম ঋজু অবস্থান অবশ্যই আশার আলো দেখায়। **মিতা দত্ত**

ব্রাজিলে বিদ্রোহ

জুন মাসের শুরুর দিকে ব্রাজিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর সাও পাওলোতে একের পর এক ছোটখাটো বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বছর জানুয়ারি মাসে শহরের মেয়র ঘোষণা করে যে পয়লা জুন থেকে শহরের বাস-মেট্রো সহ সমস্ত গণ-পরিবহণগুলির ভাড়া বৃদ্ধি হতে চলেছে। তারই প্রতিবাদে শুরু হয় এই বিক্ষোভগুলি। যত দিন যাচ্ছিল, বিক্ষোভের সংখ্যা ও ব্যাপ্তি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষমেশ সাও পাওলো শহরেই ১৫,০০০ মানুষের এক মিছিল সংঘটিত হয়। সেই মিছিলের উপর মিলিটারি, পুলিশ আচমকা নৃশংস দমন-পীড়ন নামিয়ে আনে। নির্বিচারে, এমনকি প্রতিবাদরত মানুষজনের মুখ লক্ষ্য করেও, কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোঁড়া হয়। একুশজনের উপর আহত হন এবং ততোধিক মানুষকে আটক করা হয়। এমনকি নিজেদের পরিচয় দেখানো সত্ত্বেও সাংবাদিকরা এই আক্রমণের শিকার হন। শহরের প্রধান অঞ্চলগুলির প্রতিটি রাস্তার মোড়ে মোড়ে কোনায় কোনায় পুলিশবাহিনী লুকিয়ে থাকে এগিয়ে আসা মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিলো, শুধু মিছিল আটকানো নয়, ভবিষ্যতেও যাতে এইরকম আন্দোলন না হয়, তার জন্য আতঙ্ক বিস্তার করাও ছিল এর লক্ষ্য। কিন্তু শাসকদের উদ্দেশ্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে জনগণই যে শেষ কথা বলে, তা আরো একবার প্রমাণ করলো এই মিছিল এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলি।

মাত্র কুড়ি সেন্টাভো (ব্রাজিলীয় মুদ্রা, ১ রিয়াল = ১০০ সেন্টাভো) ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সাও পাওলো শহরের মিছিল এবং তার উপর এই বর্বর আক্রমণের ঘটনা ব্রাজিলের মতো দেশ জুড়ে এক অসামান্য গণবিক্ষোভের সূচনা করে, যা কয়েকদিন পূর্বেও ছিল অকল্পনীয়। দমনের খবর ও চিত্রগুলি প্রধানত সামাজিক মিডিয়ার দৌলতে দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যায়। বাজারি খবরের কাগজ এবং টেলিভিশন মিডিয়া, যারা এতদিন এই মিছিলগুলি সম্পর্কে গুণ্ডামি, সম্পত্তি ধ্বংসের লাগাতার অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল, তারাও এই খবর একান্ত বাধ্য হয়েই প্রচার করতে শুরু করে। পুলিশি নিপীড়নের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে দেশের মানুষের মনে পড়ে যায়, আগেকার সামরিক শাসনের অন্ধকার পর্ব ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। দাবানলের মতো প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রায় প্রতিটি প্রধান শহর এবং আঞ্চলিক রাজধানীগুলিতে। তিন-চারদিনের মধ্যে পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ পথে নামে সাও পাওলো, ব্রাসিলিয়া, রিও-দি-জেনিরোর মতো বড়ো বড়ো শহরগুলিতে। মফস্বল শহরগুলিতেও মানুষের ভিড় উপচে পড়ে।

আপাত দৃষ্টিতে এই দেশব্যাপী গণবিক্ষোভের তাৎক্ষণিক কারণ বাসভাড়া বৃদ্ধি হলেও, আসলে এই ভাড়া-বৃদ্ধি বহুদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ ও বঞ্চনার বারুদের স্তূপে একটি স্ফুলিঙ্গের কাজ করে। বিশ্বের অর্থনৈতিক সঙ্কটের আগের গত এক দশক ব্যাপী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যথেষ্ট উচ্চহারে বজায় থাকার ফলে 'ব্রিকস' (BRICKS) গ্রুপ (ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না, সাউথ আফ্রিকা) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সহ ব্রাজিলের অভ্যন্তরীণ বাজারকে সংকটগ্রস্থ বিশ্ব পুঁজিবাদ পরিত্রাণের পথ হিসাবে দেখেছিল। ২০০২ সালের সাধারণ নির্বাচনে *লুলা*র নেতৃত্বে ব্রাজিলের ওয়ার্কাস পার্টি জয়লাভ করে যখন ক্ষমতায় আসে, তখন দেশের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। লুলা নিজেও ছিলেন একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এটা অনস্বীকার্য, এই সময়পর্বে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি এসেছে এবং দারিদ্রও কিছু পরিমাণে লাঘব হয়েছে। লুলা সরকার যেমন একদিকে কিছু জনপ্রিয় সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল আবার একই সাথে সরকারি সম্পত্তির একের পর এক বেসরকারিকরণের নীতিও গ্রহণ করেছিল। পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে ২০০৮-এর অর্থনৈতিক মন্দার পর থেকে, যা ব্রাজিলের অর্থনীতিকে ভালোমত প্রভাবিত করে এবং তার বৃদ্ধির হার মন্থর করে। ২০১২ সালে ব্রাজিলের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৫ শতাংশ। দেশে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়।

বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সঙ্কট সৃষ্টি করে।

ধনী এবং দরিদ্রের বৈষম্য ব্রাজিলে এখনো মারাত্মক এবং পৃথিবীর অন্যতম বৈষম্যপূর্ণ দেশ। লুলা সরকারের পরবর্তী *দিলমা রুসেফ*-এর মধ্য-বামপন্থী সরকার আপাতদৃষ্টিতে তাঁর পূর্বসূরীর মতো জনকল্যাণকামী মুখোস পরলেও আসলে এই সরকারও সাম্রাজ্যবাদীদের চাপের কাছে ক্রমশ আত্মসমর্পণ করছিল। সরকারি ঋণের বিপুল বোঝার মোকাবিলা করতে গিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার কাটছাঁট শুরু করে দিয়েছিল। সরকারি কর্মীদের পেনশনের উপর আক্রমণ সহ একের পর এক অপ্রিয় জনবিরোধী পদক্ষেপ নামিয়ে আনছিল। তার উপর এই বছর ব্রাজিলে ফুটবলের কনফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, পরের বছর ফুটবলের বিশ্বকাপ এবং তার দুবছর বাদে অলিম্পিক হবে। একের পর এক এই আর্ন্তজাতিক ক্রীড়াযজ্ঞের জন্য স্টেডিয়াম সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগুলির ব্যাপক সংস্কার এবং নবনির্মাণের পিছনে সরকার অভূতপূর্ব অর্থব্যয় করছে। এবং এর সাথে অবধারিতভাবে যোগ হয়েছে একের পর এক আর্থিক কেলেংকারি ও দুর্নীতির গল্প। ফলে একদিকে পরপর জনবিরোধী কার্যকলাপ ও সামাজিক সুরক্ষার হ্রাস আর অন্যদিকে খেলাধুলার বিপুল খরচ এবং তজ্জনিত আর্থিক ভ্রষ্টাচার— এইসব মিলিয়ে জনগণ এমনিতেই ফুঁসছিল। ব্রাজিলের মতো দেশে, যেখানে ফুটবল খেলাকে প্রায় দেবজ্ঞানে বন্দনা করা হয়, সেখানে কনফেডারেশন কাপের খেলা চলাকালীন মাঠের বাইরে বিক্ষোভ এবং পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ চলছিল। রোমারিও থেকে শুরু করে দেশের বহু প্রাক্তন ফুটবল তারকাও এই আন্দোলনের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে সোচ্চার হন। কিন্তু এই আন্দোলনের নেতৃত্বের রাশ অনেক জায়গাতেই, সাধারণ গণতান্ত্রিক এবং বামপন্থীদের হাত থেকে চলে গেছে সংগঠিত জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীল ও দক্ষিণপন্থীদের দখলে। বহু মিছিল থেকে বামপন্থী এবং ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা-কর্মীদের চিহ্নিত করে বের করে দেওয়া হয়। তাদের পতাকা-ব্যানার-পোস্টার— এগুলিও ছিঁড়ে ফেলা হয় বা নামিয়ে রাখতে বলা হয়। মিডিয়ার টানা অপপ্রচার আন্দোলনটির অভিমুখ দক্ষিণপন্থী দিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। অনেক মিছিলে শুধুমাত্র ব্রাজিলীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সাদা পোশাক পরে শুধুমাত্র শাসক দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু কিছু মিছিল থেকে গর্ভপাত-বিরোধী এমনকি সামরিক শাসনের ডাক দিয়ে স্লোগানও উঠে আসে। পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ, বিশ্বকাপের খরচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা সামাজিক সুরক্ষা পুনর্বহালের দাবিগুলি অনেক জায়গায় পিছনে চলে যায়। বিভিন্ন জায়গায় দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের পৃথক মিছিল ও আন্দোলন দেখা গিয়েছে। তবে দেশের সাধারণ ও মেহনতি মানুষ, যাদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য খুবই গৌরবময়, তাঁরাই এখনো আন্দোলনে শক্তি যোগাচ্ছেন। যে সংগঠন সাও পাওলোতে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রথম এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলো সেই 'মুভমেন্ট ফর ফ্রি পাস' বামপন্থীদের উপর এই আক্রমণকে কড়া ভাষায় নিন্দা করে এবং সাও পাওলোতে সেরকম মিছিলে যোগদান করতেও অস্বীকার করে। ফলে সেই মিছিলগুলোতে সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ভয়ঙ্কর ভাবে কমে যায়। আন্দোলনের ফলে সাও পাওলোর মেয়র ইস্তফা দেন, দিলমা সরকার আলোচনায় বসে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সামাজিক সুরক্ষার উন্নতির প্রতিশ্রুতি দেন।

অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও শেষপর্যন্ত ব্রাজিলের এই ব্যাপক গণআন্দোলন বর্তমানে বিশ্বজুড়ে চলমান বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলনকে যে আরো শক্তিশালী করবে, সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। **সুমিত্রণ**

উত্তরাখন্ডের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়

পুজো বা গরমের ছুটিতে উত্তর ভারতের যে কোনো ট্রেনেরই আগাম বুকিং পাওয়া যে কতটা অনিশ্চিত, তা আমরা সবাই জানি। উত্তর ভারতের পাহাড়ের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের অমোঘ টানে মোহিত সারা পৃথিবীর মানুষ। কেউ যান অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে, কেউ বা নিছক ছুটি কাটাতে। কিন্তু ১৬ জুলাই যখন টিভিতে সেখানকার বিপর্যয়ের খবরটা প্রথম পাওয়া গেল, তখনও ঠাহর করা যায়নি ক্ষতির পরিমাণ। তারপর যত দিন গেছে, ধ্বংসের মাত্রা হিম করে দিয়েছে গোটা দেশকে। বলা হচ্ছে, গোটা অঞ্চলকে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে নাকি বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে।

এদিকে মিডিয়াও নানান ঢঙে নানা ধরনের সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। ধর্মব্যবসায়ীরা ক্রমাগত বলে চলেছেন যে কিছু একটা অশুভ, অকল্যাণসূচক, অমঙ্গলজনক নিশ্চয়ই ঘটেছে— যার জন্য এত জীবনহানি। তবে সাধুসন্তরা যে 'পাপ' এর ইঙ্গিত করছেন, খানিকটা সে কথারই যেন বাস্তবানুগ চেহারা ফুটে উঠছে বিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ ও শিক্ষিত জনগণের ভাবনায়। যথেচ্ছ গাছ কাটা, ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা তৈরি, জলবিদ্যুতের লাগামছাড়া প্রকল্পে ঢালাও অনুমতি, অতিরিক্ত ঘন-বসতি, ট্যুরিজম ব্যবসার জন্য পরিবেশ-প্রকৃতি নিয়ে নয়-ছয়, স্রেফ তীর্থের নামে, পুণ্যের নামে। এ কি 'পাপ' নয়? মানুষের নিজেরই হাতে রোপন করা এ ধ্বংসের বীজ।

অনেকগুলো দিকের কথা তেমনভাবে উঠে আসছে না কোনো আলোচনায়, সরকারও সেসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়, সব মৃত্যুই মর্মান্তিক, সে

প্রাকৃতিক দুর্যোগেই হোক বা অন্য কিছু। কিন্তু এত মৃত্যুও কি পারবে আমাদের চোখ খুলে দিতে? কিন্তু একি শুধুই প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা? না, তা নয়। মানবসভ্যতার অবিবেচক বুদ্ধিই নিজে হাতে ডেকে এনেছে এই বিপর্যয়। কিছু মিডিয়া এই চূড়ান্ত অবিবেচনার দিকে ইঙ্গিত করলেও, তাদের স্বর নিতান্তই ক্ষীণ, আর বিক্রি হয়ে যেতেও খুব বেশি দেরি হচ্ছে না তাদের। কিন্তু আমরা কি চুপ করে বসে থাকব আর রীতিমাফিক এটাই ভেবে ক্ষান্ত থাকব যে, মানুষের কৃতকর্মের ফল ভুগতে হচ্ছে সেই মানুষকেই, প্রকৃতি নিচ্ছে তার চরমতম 'প্রতিশোধ'? মনে হয়, সময় এসেছে এটুকু ভেবেই ক্ষান্ত না হওয়ার, বরং আরেকটু বোঝার চেষ্টা করার, ঠিক কী কী কারণ রয়েছে, যার জন্য এরকম একটা ভয়াবহ জাতীয় বিপর্যয়ের আকার ধারণ করল ১৬ই জুনের ওই দুর্যোগ?

উত্তরাখন্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। উৎপত্তিগতভাবে পর্বতসংকুল এই ভূখন্ড বাস্তবিকই দুর্ঘটনাপ্রবণ। ভূতাত্ত্বিক অস্থিতিশীলতাই প্রধানত এই সব বিপর্যয়ের কারণ। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝেই ভূমিকম্প হয়। পাশাপাশি হড়কা বান, হিমানি-সম্প্রপাত, মেঘভাঙ্গা বর্ষণ, খরা এবং দাবানলের ঘটনাও মোটেই বিরল নয়। এসব ছাড়াও সর্বক্ষণের জন্য রয়েছে ধসের আশংকা। ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় "সেই ১৮৯৩ সালে অতিবৃষ্টিজনিত বিশাল ধসে, কেন্দ্রীয় হিমালয়ে বিহারী গঙ্গানদী আটকে তৈরি হয়েছিল ৩৫০ মি উঁচু এক বিশাল বাঁধ। বাঁধে আটকে যাওয়া ৫ কিমি লম্বা আর ২ কিমি চওড়া এই জলাধারটিকে স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছিলেন 'গহনা তাল'। প্রায় ৭৬ বছর পর আবার একবার অতিবর্ষণের পর ১৯৭০ সালের ২০শে জুন ভেঙে পরে সেই বাঁধ। এর প্রভাবে ১১০ কিমি দূরে শ্রীনগর শহরে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েছিল ৫০ মি। গোটা শহরটাই চলে গিয়েছিল জলের তলায়। আরো ১২৫ কিমি দূরে, হরিদ্বারের উপকণ্ঠে যেখানে নদীটি গঙ্গায় এসে মেশে, সেখানে গঙ্গার জলস্তর বেড়েছিল প্রায় ৪ মি"। ওই ৭৬ বছরে এবং তার পরেও, ১৬ জুনের বিপর্যযের আগে আরো কত শত যে ছোট বড় মাঝারি ধরনের বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে উত্তর ভারতের এই ভূখণ্ডে তার ইয়ত্তা নেই।

গোটা ব্যাপারটাকে বুঝতে গেলে প্রথমে জানতে হবে হিমালয়ের প্রকৃত ভৌগোলিক আর ভূতাত্ত্বিক রূপকে। ঠিক আল্পসের মতই হিমালয়ও তৈরি হয়েছে টেথিসে জমা পলি থেকে এবং শিলামণ্ডলে (lithosphere) ও ভূ-ত্বকে (Crust) চ্যুতি ও ভাঁজ প'ড়ে। যখন ভারতীয় প্লেট উত্তর ইউরেশীয় প্লেটের দিকে সরে আসতে থাকে, তখন থেকেই হিমালয় পর্বতমালার গঠন প্রক্রিয়া শুরু। প্রায় ৭০ লক্ষ বছর আগে হিমালয় সমুদ্রতল থেকে উঁচু হতে শুরু করে এবং ২৫ লক্ষ বছর আগে তার পাত-সংস্থানজনিত উন্নতি (plae-tectonic rise) বন্ধ হয়। দেখা গেছে, হিমালয় বেল্ট-এর অক্ষ বরাবর ভূমিকম্পের কম্পাঙ্ক আর তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তনের শক্তি কমে গেলেও একেবারে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। হিমালয়ের গোটা পর্বতমালা (orogenic belt) প্রায় ২৪০১ কিমি দীর্ঘ, যা পশ্চিমে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী থেকে শুরু করে পাকিস্তান, নেপাল, ভারত, সিকিম এবং ভুটানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ বাঁক পর্যন্ত বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য বরাবর এই বেল্টে আছে দুটো সমান্তরাল রেঞ্জ। এই দুই রেঞ্জের মধ্যবর্তী উপত্যকায় পশ্চিমবাহী সিন্ধুনদ এবং পূর্ববাহী ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা অঞ্চল অবস্থিত। হিমালয়ের পর্বতমালা পাত-সংস্থানগত (plate-tectonic) দিক থেকে চারটি ভাগে বিভক্ত, যার একটি হলো অব-হিমালয় (sub-himalaya) বা শিবালিক হিমালয়, যেখানে বর্তমানে সংবাদের শিরোনামে থাকা উত্তরাখন্ডের গাড়োয়াল অঞ্চল অবস্থিত। এটি হিমালয়ের একেবারে দক্ষিণতম ভাগ এবং ভৌগোলিক দিক থেকে নবীনতম পূর্ব-পশ্চিম পর্বতশৃঙ্খল। শিবালিক অংশটি সাধারণভাবে বেলেপাথর আর কনগ্লোমারেট শিলা দিয়ে তৈরি; এইসব পাথরের উৎস হল শিবালিকের পেছনদিকে থাকা বিরাট পর্বতশ্রেণীর ভাঙ্গাচোরা অংশ, যা শক্তপোক্ত হলেও ভেতরে খুব দৃঢ়-সন্নিবদ্ধ অবস্থায় নেই। ভাঁজযুক্ত শিলাস্তরে উঁচু পর্বতশ্রেণী তৈরি হবার পর তা থেকে ক্ষয়ের ফলে মোটা দানার পলি প্রান্তদেশীয় হ্রদ বা প্রান্তিক সমুদ্রে (এক্ষেত্রে টেথিস) পুরু 'মোলাসে' জাতীয় নদীর অবক্ষেপ হিসাবে জমা হয়। হিমালয়ের পাদদেশও এভাবেই তৈরি হয়েছে, যা ভেতরে ভাঁজ করা অবস্থায় টালির মতো বিন্যস্ত রয়েছে। হিমালয়ের প্রধান কেন্দ্রীয় চ্যুতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, পর্বত গঠনের প্রক্রিয়াটি এখনো অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে চলছে (active orogen)।

তাছাড়া এই অংশটি যে বেলেপাথরে তৈরি, তার উৎপত্তি সংঘাতজনিত কারণে অনেক দানাজাতীয় পদার্থ একসঙ্গে জমাট বেঁধে। এই জমাট বাঁধানোর মূল উপাদানগুলো হলো সিলিকা ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট। বেলেপাথর দিয়ে তৈরি শিলাস্তরে সাধারণভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল বা অন্যান্য তরল প্রবেশ করতে পারে এবং এইসব পাথর সচ্ছিদ্র হবার জন্য অনেকটা পরিমাণে তরল তাদের মধ্যে ধারণ করে রাখতে পারে। এইরকম ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এইসব অঞ্চল বেশ ধসপ্রবণ এবং যথেচ্ছভাবে বসতি স্থান করলে এখানে ধসের সম্ভাবনাও অনেকাংশে বেড়ে যায়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বর্তমান সময়ের বিশ্ব-উষ্ণায়ণ এবং লাগামছাড়া শিল্পায়নের সমস্যা (প্রধানত অ্যাসিডবৃষ্টি, যার ফলে ক্রমাগত আলগা হয়ে চলেছে

ক্ষয়ক্ষতি

- রুদ্রপ্রয়াগ থেকে শ্রীনগর (উত্তরপ্রদেশ)— ১০৩ কিমি রাস্তার প্রায় পুরোটাই নিশ্চিহ্ন।
- শোনপ্রয়াগ শহরের প্রায় অর্ধাংশ এখনও জলের তলায়।
- গৌরীকুন্ড এবং কেদারনাথের মধ্যবর্তী রামবাড়া গঞ্জটি ধ্বংস হয়েছে।
- উত্তরাখন্ডের এই অংশে ১ লক্ষ মানুষ গৃহহীন।
- সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকা।
- ১০০০ কোটি টাকার বিমা সংক্রান্ত দাবি বিমা নিগমের দপ্তরে জমা পড়েছে।

পরিকাঠামো ও বিপর্যয়

- ২০১১-র জনগণনা অনুসারে উত্তরাখন্ডের লোকসংখ্যা ১.০৮ কোটি। ২০১১-১২ সালে পুণ্যার্থী-ভ্রমণার্থী মিলিয়ে পর্যটকের পরিমাণ ছিল ২.৬৮ কোটি— লোকসংখ্যার দুগুণ!
- বিপর্যয়ের আগে ১৫ দিনে সড়কপথে ১ লক্ষ গাড়ি চলাচল করেছে, যেখানে সড়ক নির্মাণের সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বছরে সর্বাধিক ২৫ হাজার গাড়ি চলাচল করবে।
- বিপর্যয়ের ১৫ দিন আগে থেকে প্রতিদিন ৩০০টি হেলিকপ্টারের উড়ান চলেছে পর্যটকদের জন্য— অস্থায়ী হেলিপ্যাড নির্মাণে যথেচ্ছ ডিনামাইট ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে যে ঘাস নষ্ট হয়েছে তা পূরণ হতে ১ দশক লাগবে!

পর্যটন

- ২০০৫-০৬ সালে এই রাজ্যে পর্যটন খাতে যে পরিমাণ লগ্নি হয়েছিল, ২০১১-১২ তে তার ২২৮ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে।
- বর্তমানে ২২টি পর্যটন-ভিত্তিক নির্মাণ প্রকল্প চলছে— লগ্নির পরিমাণ ১৮৪০ কোটি টাকা— পুরোটাই বেসরকারি।
- সারা দেশে পর্যটনে যত পিপিপি মডেলে প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে, তার ৪৭ শতাংশই রূপায়িত হচ্ছে উত্তরাখন্ডে।

বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থা

- রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে ২০০৭ সালে।
- ২০১৩ পর্যন্ত সেই কর্তৃপক্ষের কোনো বৈঠক হয়নি।
- বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকল্পনা তৈরি হয়নি এখনও।
- বিশেষজ্ঞ নেই— ৪৪% বিশেষজ্ঞ পদ শূন্য।
- পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছিলো সেই অর্থ ব্যবহার করতে না পারায় ২০১১-১২ সালে কেন্দ্র এই রাজ্যটিকে এই খাতে কোনও অর্থ মঞ্জুর করে নি!

বেলেপাথরের বাঁধন, কারণ অ্যাসিডে ক্ষয় পাচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। আর অন্যদিকে এর ফলে তৈরি হয়ে চলেছে আরো কার্বন ডাই-অক্সাইড, যা একটি মুখ্য গ্রিনহাউস গ্যাস)।

এ সবই হলো যা ঘটে চলেছে সেসবের একটা অত্যন্ত সরলীকৃত রূপ মাত্র। বাস্তব চিত্রটা অনেক বেশি ভয়াবহ। ভয়াবহ, কারণ হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র খুবই সংবেদনশীল এবং সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হলে খুব সহজেই তা ভেঙে পড়তে পারে। ভয়াবহ, কারণ ট্যুরিজম-শিল্পের অসংযমী, অপরিকল্পিত এবং অপরিণামদর্শী বিকাশ হয়ে চলেছে এইসব অঞ্চলে। ভঙ্গুর পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠছে সব বড় বড় হোটেল আর রিসর্ট আর সেখানে পৌঁছনোর জন্য ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা। ধর্মের খাতিরে পর্বতের রক্ষাকবচ যে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে, তাতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলে তৈরি হচ্ছে বিশ্রামাগার, ধর্মশালা, অজস্র মন্দির। এর সাথে যোগ করা যেতে পারে দেশ-বিদেশের অগণিত ভ্রমণার্থী, পুণ্যার্থীদের অবদান, যাঁরা হিমালয়ের ভঙ্গুর ও সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে নিতান্ত অবজ্ঞার কারণে পাহাড় জুড়ে শহুরে আবর্জনা, মূলত প্লাস্টিক ছড়িয়ে সর্বনাশের মাত্রা আরো বাড়িয়ে চলেছেন। এর পাশাপাশি রয়েছে অসিগঙ্গা, বিহারিগঙ্গা, ধৌলিগঙ্গা প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দিয়ে গড়ে তোলা একের পর এক অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় সব জলবিদ্যুৎ প্রকল্প।

এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কথা, তাদের ভয়াবহ প্রভাবের কথা না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কমবেশি প্রায় ২০০টা প্রস্তাবিত প্রকল্প রয়েছে। সবকটাই গঙ্গা আর তার বিভিন্ন উপনদীর ওপরে। জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্য যে টারবাইন ঘোরানো হয়, তা করার কথা নদীর স্বাভাবিক স্রোতকে কাজে লাগিয়েই, যাকে বলা হয় Run on River বা ROR scheme। কিন্তু বাস্তবে তা না করে বানানো হলো কতগুলি টানেল আর গোটা উপত্যকার নদীগুলোর জলকে বইয়ে দেওয়া হলো ওই টানেলগুলোর মধ্যে দিয়ে। ২০০টার মধ্যে ২৬টা বাদে বাকি সবগুলোই এই ধরনের এবং এর থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা হলো ১৮০০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে ঐ রাজ্যের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট আর বাইরে থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের পরিমাণ ২০০০ মেগাওয়াট। অর্থাৎ ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের যোগান রয়েছে উত্তরাখন্ডের মানুষদের জন্য। এখন উত্তরাখন্ডের মোট জনসংখ্যা হলো দিল্লির দুই-তৃতীয়াংশ। দিল্লিতেও শক্তির যোগান কিন্তু উত্তরাখন্ডের পরিমাণের সমানই উত্তরাখন্ডের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ আসে চিরাচরিত উপায় থেকে। কাজেই সেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এতরকম ব্যবস্থাপনা মোটেই শক্তির চাহিদা বা অপ্রতুলতা মেটাবার জন্য নয়। তার পেছনে অন্য কারণ আছে।

২০০৭ সালে উত্তরাখন্ড ও হিমাচল প্রদেশের সরকার নিউজিল্যান্ডের একটা সংস্থা Hydro Tasmania-র ওপর ওই দুটি রাজ্যের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির দেখাশোনার ভার দেয়। এই সংস্থাটির কিন্তু হিমালয়ের বিশেষ পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। সংস্থার ''বিশেষজ্ঞ''দের মতে, পরিবেশগত নয়, হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের একমাত্র চ্যালেঞ্জ হলো তার ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষত্ব। শুধু সেটুকুর দিকে নজর দিলেই চলবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই জলবিদ্যুৎ শিল্পের সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ কোটি টাকা। আরও ৩০ কোটি ডলারের 'সুযোগসুবিধা' ধার্য করা হয় এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক থেকে। ফলে অমন অনেক বিশেষজ্ঞের সন্ধান মিলবে, সে আর আশ্চর্য কী! ওই সংস্থাটির মতে, যেসব প্রাইভেট কোম্পানি এই প্রজেক্টগুলোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, তাদের বেশিরভাগই উত্তরাখন্ডের বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে তাদের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই।

এই ২০০টি প্রকল্পের তথ্য সাধারণের নাগালের বাইরে। মাত্র ৬টি প্রকল্পের EIA (Environment Assessment Report) পাওয়া যায়, কিছু স্বাধীন গবেষণার দৌলতে। এগুলো হলো ভিলাঙ্গনা, তপোবন-বিষ্ণুগড়, বিষ্ণুগড়-পিপুলকোটি, লোহারিনাগ-পালা, পালা-মানেরি আর কোটি-বেহল। কিন্তু এই রিপোর্টগুলোও অসম্পূর্ণ। যে উত্তরগুলো এখান থেকে পাওয়া যায় না:

এক) এই কেন্দ্রগুলোর প্রায় অর্ধেকই প্রস্তাবিত পরিমাপ ও সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ধারণক্ষমতা দ্বিগুণ করা হয়েছে। ফলে বেড়ে গেছে খরচ, বর্জ্যপদার্থের পরিমাণ, টানেলের দৈর্ঘ্য, বাঁধের উচ্চতা, টারবাইনের সংখ্যা ইত্যাদি। কিন্তু কেন এগুলো বাড়ল তার কারণ কোথাও নির্দেশ করা নেই।

দুই) সব কটি প্রকল্পই তৈরি হয়েছে ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলে (Seismic Zone IV and V)। এইসব জায়গাগুলোতে এমনকি খুব শক্ত কোয়ার্টজাইট-গ্রানাইট-নিস পাথরও চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় আছে। দুটি টানেল (প্রতিটি ১৩ কিমি দীর্ঘ) এই ভূমিকম্প-প্রবণ আর ভূ-তাত্ত্বিকভাবে ভীষণ সক্রিয় অঞ্চলের ভেতর দিয়েই গেছে। এর ফলে যে ঐসব অঞ্চল আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা ভূমিকম্পের সম্ভাবনা আরো বাড়তে পারে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা হয়নি।

তিন) বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর টানেল, পাওয়ার-হাউস ইত্যাদি তৈরির জন্য যে পরিমাণ মাটি খোঁড়া হবে আর তার জন্য যে পরিমাণ আবর্জনা তৈরি হবে, সেগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোনো কথা ওই রিপোর্টে বলা নেই। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বলা আছে যে ওই আবর্জনাপূর্ণ স্থানে ওর ওপর উর্বর মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু সেই মাটিই বা কোথা থেকে আসবে, সে সম্পর্কে কিছু বলা নেই। আর, স্পষ্টতঃই এগুলো করতে যে বিপুল পরিমাণে সিমেন্ট, বালি, যন্ত্রাংশ, লোহা এবং বিস্ফোরক বহন করতে হবে, আর তার জন্য পাথর গুঁড়িয়ে রাস্তা বানাতে হবে এবং তাতে যে অঞ্চলগুলো আরো বিপদগ্রস্ত আর দূষিত হবে, সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখই নেই ওই রিপোর্টে। তাছাড়াও বেলেমাটিযুক্ত এইসব অঞ্চলে ক্ষয়কার্যের ফলে নদীতে পলি জমার প্রবণতা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই পলি জমা হবে বাঁধগুলোর নিচের অংশে। এই পলির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও কিছু বলা নেই ওই রিপোর্টে।

চার) নদীর গতিপথকে ঘুরিয়ে যেভাবে টানেলের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হচ্ছে, তাতে স্থানীয় সেচব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এবং ভৌমজলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। তার ওপর, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে যে বিপুল পরিমাণ অরণ্য নিধন করা হচ্ছে, তাতে মাটি আরো আলগা হয়ে পড়ছে ও ধসের সম্ভাবনাও বাড়ছে। কিন্তু তার কোনো উল্লেখ ওই রিপোর্টে নেই।

পাঁচ) গোটা নদী উপত্যকা জুড়ে কোথায় কোথায় খাদ আছে বা ভূস্খলনের ফলে খাদ তৈরি হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ওই রিপোর্টে পাওয়া যায় না। জলাধারগুলোর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ওই রিপোর্ট কোনো আলোকপাত করে না। নদীগুলোর জলকে টানেলের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য সামগ্রিকভাবে অঞ্চলগুলোর পরিবেশ ও ভূ-প্রকৃতির ওপর যে কী ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে, তার কোনো মূল্যায়নও ওই রিপোর্টে নেই।

এখন এই পরিস্থিতিতে, বাস্তুবিদ্যা ও ভূতত্ত্বের পাশাপাশি বিষয়টা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও দেখা দরকার। অর্থাৎ উন্নয়নের যে মডেল গত দু-দশক ধরে অনুসৃত হচ্ছে, তাতে কম-বেশি সব রাজনৈতিক দলেরই ভূমিকা এক— কেন্দ্রে বা রাজ্যে যেখানেই তারা ক্ষমতায় থাকুক না কেন। (বিজেপি উত্তরাখন্ডের বর্তমান দুরবস্থার সব দায় ইউপিএ সরকারের ওপরে চাপাতে চাইছে বটে, কিন্তু ঘটনা হলো উচ্চ-গাঙ্গেয় উপত্যকার বাঁধ পরিকল্পনাগুলো সব বাজপেয়ীর সময়েই অনুমোদন পেয়েছিল) সমাজের উঁচুতলার মানুষদের নিয়ে তৈরি বাজারই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-নিয়ন্ত্রিত এই নকশার লক্ষ্য; এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই গরীবদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত না করে এর শেষ হবে না। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলগুলোতেও এর কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছে না। গালভারী পিপিপি মডেলের নাম করে সারা দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে, আর বলাই বাহুল্য, তারা তাদের খরচ কমিয়ে লাভের অঙ্ক বাড়ানো ছাড়া ভাবছে না আর কিছুই। উত্তরাখন্ডে প্রোমোটারদের যথেচ্ছ পরিমাণে কর-ছাড় দিয়ে জলের দরে তাদের হাতে সেখানকার জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে,

এর পর ১৮ পৃষ্ঠায়

কবিতা

কামদুনিকে সেলাম

অচিন্ত্য সুরাল

চমকে দেওয়ার জবাব দিতে পদ্য লিখে রাখি
সত্যি যা তা লিখছি বলে মাফ কোরো গুস্তাকি

এখন বুঝতে পারি
এখন বুঝতে পারি নই আনাড়ি এই কথা কি জানো?
কাকেই বলে বদলে যাওয়া কোনটা বা পাল্টানো

সেটা ভালই জানি
সেটা ভালই জানি তেলের ঘানি কলু যেমন জানে
বেদ যে জানে তার অধিকার নিশ্চিত পুরাণে

আমার আপনদলের
আমার আপনদলের হাতবদলের হাত তো চিনি আমি
ভঙ্গিমাতে ঠিক বুঝে যাই কেমন বদলকামী

তোমার রঙের উপর
তোমার রঙের উপর সোনা রূপোর প্রলেপটা জমকালো
আসলে তা বীভৎস আর অমানিশার কালো

মাটির মানুষ জানে
মাটির মানুষ জানে কার বাগানে কোন ফসলের চাষ
সেই জানাকেই তোমরা বল মাওবাদী সন্ত্রাস

কাজেই আর কথা কি
কাজেই আর কথা কি রইল বাকি? রইল যতেক বাকি
বলতে গেলে খুলতে হবে অনেক কথার ঝাঁপি

মানুষ ভুলবে না আর
মানুষ ভুলবে না আর ক্ষোভের পাহাড় জমছে দিকে দিকে
সেলাম জানাই বিস্ফোরণে দৃপ্ত কামদুনিকে

কলকাতা, ২১-০৬-২০১৩ (মহামিছিলের দিন)

আজকের ছড়া

সৃজন সেন

বলতে পারেন কাগজগুলো
কোন্ ঘটনা ছাপছে রোজ?
কে কোথায় হয় ধর্ষিতা আর
কে কে হঠাৎ হয় নিখোঁজ?

বলতে পারেন সেই খবরে
ওঠেন ক্ষেপে কোন্ বাঘিনী?
হালুম হালুম করে নিত্য
আঁচলে ঘাম মোছেন যিনি!

বলতে পারেন সে খবরে
আহ্লাদে আজ নাচছে কারা?
বহু বছর গদিতে থেকে
গদিহারা আজকে যারা।

মুঠো পাকানো ছড়া

মৃন্ময় চক্রবর্তী

১
গড়গড়ের মা' লো
তোর গড়গড়াটা কই
ধানের জমি রাজায় খেল
হাকিম নড়ে কই
হাকিম নড়ে রাজার কথায়
তুই কোথাকার কে
তুই মরলে দেশ এগুবে
রাজায় বলেছে।

২
আঁটুল বাঁটুল শামলা শাঁটুল
সাহেব মুদির হাটে
শামলা বেগার খাটে
ছেলে মেয়ে খিদের চোটে
পথে বসে কাঁদে
আর কেঁদো না আর কেঁদো না
ছোলা ভাজা খাও
উন্নতিরা আসছে তেড়ে
একটু সবুর দাও।

বিষয় সুন্দরবন

সাক্ষাৎকার : তুষার কাঞ্জিলাল

অনীক : প্রথমে আমরা জানতে চাইব, আয়লা পূর্ববর্তী অবস্থায় সুন্দরবনের সমস্যাগুলো কী ছিল? আয়লার আগে সুন্দরবন কী রকম ছিল আর আয়লার পরে কী হয়েছে, এটা বুঝতে চাই।

তুষার কাঞ্জিলাল: সুন্দরবন বলতে সাধারণত লোকে যেভাবে বোঝে, শহুরে মধ্যবিত্ত বা যাদের একটু বাইরে ঘোরাফেরা করার অভ্যেস আছে, তারা সুন্দরবনকে ভাবে একদিনের ফিস্ট করার জায়গা। একটা গাড়ি নিয়ে যাব, বকখালি বা রায়দীঘি বা কোথাও... মাংস-টাংস রেঁধে নিয়ে যাব... মাইক বাজিয়ে সারাদিন ঘুরে চলে আসব। রাত দেখেন না। তো এই একটা সুন্দরবন...

অনীক : বিনোদনের জায়গা...

তুষার কাঞ্জিলাল : বিনোদনের জায়গা মানে... বিশেষ করে দার্জিলিংটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, চাপটা অনেক বাড়তে লাগল, আগে অত ছিল না। আর একটা বিষয়, যাতায়াতের ব্যবস্থাটা আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হওয়ার ফলে... লোকে দার্জিলিং যেতে পারছেনা, বাইরে যাওয়ার মতো হয়তো অত পয়সা নেই, তারা সুন্দরবনটাকে বেছে নিয়েছে। এখন সুন্দরবনে যে ধরনের পর্যটনের কথা বলা হয়ে থাকে... যেটা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় থাকবে... ওদের ভাষায় ইকো-ফ্রেন্ডলি ট্যুরিজম... তো সেটা কোনকালে ছিলনা। সেটা কী, যাঁরা বলেন-টলেন তাঁরা বোঝেন কিনা ঠিক বুঝিনা... ইকো-ফ্রেন্ডলি কী ধরনের ট্যুরিজম, সেটা বিষয় নয়। বিষয়টা হচ্ছে, সুন্দরবনকে বুঝতে হলে, প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে যে সুন্দরবনের দুটো স্পষ্ট ভাগ আছে। একটা ভাগ হচ্ছে, যেখানে মানুষ বাস করে এবং সুন্দরবনের জঙ্গল। জঙ্গলে সম্পূর্ণ intervention ঘটে গেছে। এই একটা সুন্দরবন। পশ্চিমবাংলার বা ভারতবর্ষের সুন্দরবন বলতে যেটাকে আমরা বুঝি, সেটায় মোট ১০২টা দ্বীপ। অবশ্য এর মধ্যে দুটো দ্বীপ এখন সমুদ্রের তলায় চলে গেছে।

অনীক : এর মধ্যে একটা কি ঘোড়ামারা?

তুষার কাঞ্জিলাল : হ্যাঁ ঘোড়ামারা এবং তার পাশে আর একটা ছিল। ঘোড়ামারায়, ধরুন আট-দশ হাজার লোকের বসতি ছিল, সেখানে এখন পাঁচ-সাতশো লোক বাস করে... সেটাও চলে যাবে। থাকবে না। যেটা বলছিলাম, এই ১০০টা দ্বীপ যদি আমি ধরি-- তার মধ্যে ৫৪টা দ্বীপে মানুষ বাস করে। বাকি ৪৮টা দ্বীপে ফরেস্ট কভার আছে, যেটাকে আমরা সুন্দরবন জঙ্গল বলি। এখন, আপনাকে প্রথমেই বুঝতে হবে যে সুন্দরবনটা কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বদ্বীপ তৈরি হয়েছে। কেউ তৈরি করে দেয়নি। এবং মানুষের বাসযোগ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত এটা প্রকৃতির রাজত্ব ছিল এবং প্রকৃতির নিয়মে চলতো। অর্থাৎ কোন কোন ধরণের প্রাণী ওখানে adapt করে টিকে থাকতে পারবে, তাদের খাদ্যচক্র কী হবে, বেঁচে থাকবে কী করে, এই সমস্ত ব্যবস্থা প্রকৃতির ছিল। গণ্ডগোলটা বাধলো একটা সময়ে, ধরুন ১৮৫৬-৫৭-এর পরে। ইংরেজরা ভাবলো, এই যে এক বিরাট জায়গা পড়ে আছে, এখান থেকে আমরা কী পাচ্ছি এবং এখান থেকে কী পাওয়া যেতে পারে? তখন এটা ছিল যশোর ডিভিশনের আন্ডারে। তখন তো অবিভক্ত বাংলা। তারা একটা জরিপ করায়। জরিপ ক'রে একটা ইমাজিনারি লাইন তাঁরা ঠিক করেন এবং ঠিক করে বলা হয়, এপারটা হলো সুন্দরবন।

অনীক : হজেশ লাইন?

তুষার কাঞ্জিলাল : হ্যাঁ। তারপর তাঁরা ঠিক করলেন, সরকার দ্বীপগুলোকে ইজারা দিয়ে দেবেন— অনাবাসীদের মধ্যে। কী কারণে এই জিনিসটা ঘটলো— একটা হচ্ছে, জমি-কাঙাল মানুষ, বিশেষ করে যশোর-খুলনা থেকে, এদিকে মেদিনীপুর থেকে প্রচুর মানুষ, যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের বা আদিবাসীদের মধ্যে বলা যায়, যাঁরা আদি বাসিন্দা ওখানকার, একটু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষরা তখন বসত করতে আরম্ভ করে।

অনীক : এটা কোন সময় মোটামুটি?

তুষার কাঞ্জিলাল : ধরুন ১৮৭০-৭৫, এই সময় থেকে শুরু হয়।

অনীক : সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী কাল?

তুষার কাঞ্জিলাল : সাঁওতালদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কারণ সুন্দরবনে সাঁওতাল নেই। সুন্দরবনে দুটো শ্রেণী গেছে। ওঁরাও এবং ভূমিজ। সাঁওতাল পরগনা থেকেই তারা গেছে। যাই হোক, অনাবাসী জমিদারদের লীজ দিয়ে দিল। অনাবাসী জমিদাররা লীজ নিয়ে নেওয়ার পরে এখানে মানুষের বসত গড়ে ওঠার পূর্বশর্তগুলো ছিল কী? প্রথম তো জঙ্গল হাসিল করতে হবে। সম্পূর্ণভাবে জঙ্গলকে উড়িয়ে দিতে হবে। এবং জঙ্গলের যত বন্য প্রাণী আছে, তাদের তাড়াতে হবে। দু নম্বর হচ্ছে, সুন্দরবনের যে দ্বীপগুলি, তাকে ঘিরে যে নদী আছে, সেই প্রত্যেকটি নদী প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত। তার ফলে যেটা ছিল, এটা জোয়ার-ভাটার নিয়মে চলে। জোয়ারে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট জল বেড়ে যায়, আবার ভাটায় তার অনেকটাই নেমে যায়। কিন্তু সবটা নামেনা। যেটা নামেনা, সেটা একটা marsh তৈরি করে নদীর মধ্যে। সেটাকে বলা হয় dead water zone। এই কথাটা এই জন্য বললাম, সুন্দরবনে নদীতে যে ভাঙন, বাঁধে ভাঙন, তার মূল কারণগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে এই ডেড ওয়াটার জোন।

তাহলে দেখা গেল, এই দ্বীপগুলিকে ঘিরে যে নদীগুলি আছে, সেগুলিও ভরা জোয়ারে ২০/২২ ফুট উঠে যায়। কিন্তু আমরা

সর্বনাশটা যেটা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আমরা যখন ওখানে মানুষের বসতি গড়ে তুলি, তখন সেই দ্বীপগুলি যতটা উঁচু হলে গড়ে ওঠা উচিত ছিল তার আগেই বসত গড়ে তুলি। তার একটা কারণ আছে। তার কারণ হচ্ছে যে filtration process, সেটা যত নীচু থাকে, তত তাড়াতাড়ি হয় এবং শেষের দিকটা অনেক সময় নেয়। কিন্তু আমরা সে অপেক্ষাটা করলাম না। আমরা সেখানে বসতি গড়ে তুললাম। তাহলে, বসতি গড়ে তুলতে আমাকে কী করতে হবে? ভরা জোয়ারে যে জলটা আসে সেটা সমগ্র দ্বীপকে ২৪ ঘন্টায় দু'বার ভাসিয়ে দিয়ে যাবে। স্বাভাবিক কারণে সেখানে মাটির বাড়ি করা সম্ভব নয়, সেখানে খাওয়ার জল থাকবে না, সেখানে কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়, অতএব সেখানে মানুষের বসতি গড়ে ওঠাও সম্ভব নয়। তাহলে এই দ্বিতীয় শর্তটা কী করে আটকানো যায়? জমিদাররা সাধারণ জ্ঞান থেকে দ্বীপগুলিকে বেঁধে দিল।

অনীক : এতটা উঁচু করলেন যাতে জলটা না ঢোকে...

তুষার কাঞ্জিলাল : এখন ডিফিকাল্টি হচ্ছে এই যে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। পরবর্তীকালে বোঝা গেল এটা হয় না। এভাবে জল আটকানো যায় না, বাঁধ তৈরি করাও যায় না। যাই হোক, এইভাবে ক্রমে ক্রমে ৫২টা দ্বীপকে ঘিরে প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ গড়ে তোলা হলো। অতএব এটা ছিল দ্বিতীয় শর্ত। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, মানুষগুলি যে যাবে, সেখানে বাস করবে, সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সেখানে জমিতে ফসল ফলার মতো অবস্থা থাকা দরকার। আজকাল আমরা অনেক saline resistance variety-র কথা বলি। তখন তো এইসব বুদ্ধি-পরামর্শ কারোর ছিলনা। আর তখন ছিটেল চাষ হতো...

অনীক : মানে বীজতলা হতো না

তুষার কাঞ্জিলাল : না বীজতলা হতোনা। তারপরে হচ্ছে... এটাকে মনুষ্য বাসোপযোগী করে তুলতে হবে। তাহলে এই তিনটে শর্ত পালন করে আমাকে ওখানে মানুষের বাস গড়ে তুলতে হবে। এই তিনটে জায়গাতেই আমরা যে সর্বনাশটা করেছি, সেটা হলো প্রথমত pre-matured সেটেলমেন্ট গড়ে তুলেছি। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা এমন পর্যায়ে করেছি যে ১০২টা দ্বীপের মধ্যে ৫৪টাতে জঙ্গল সাফ করে দিয়েছি। আজকাল আপনারা প্রায়ই বলেন ecological balance, মানুষ শুরু করলো তো imbalance তৈরি করে। কেননা এই যে বাদাবনের গাছগুলি দ্বীপগুলিকে ঘিরে থাকত বা ছিল... এখনও কিছু আছে, তারা দুটো কাজ করতো। একটা হচ্ছে, খাদ্যচক্র সুন্দরবনে যেটা ছিলো, সেটা এই বাদাবন ছাড়া সম্ভব ছিলনা। এই ধরনের গাছ ছাড়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সুন্দরবন হচ্ছে cyclone prone area, মানে ঝড়-প্রবণ এলাকা। যখন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ হয়, তার ফলে যে ঘূর্ণিঝড় হয়, সবই প্রাকৃতিক নিয়মে, সেটা ঝড় আকারে অন্ধ্র কোস্ট থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত পুরো জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং তার মধ্যে সুন্দরবন উপকূলটা সবচেয়ে vulnerable, যেখানে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাদাবনের কাজ ছিল, ঐ ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটাকে সামলানো। ওটা একটা buffer zone তৈরি করেছিল। মানে shock absorber আর কী।

অনীক : উড়িয়ে দেওয়া মানে হচ্ছে...

তুষার কাঞ্জিলাল : ঝড়কে ডেকে আনা, যাতে ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

অনীক : তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, যে কটা দ্বীপ হাসিল করে বসতি হলো, সেগুলো মোটামুটি ঝড়ের সামনে exposed হয়ে গেল।

তুষার কাঞ্জিলাল : exposed হয়ে গেল। এবং শুধু তারাই exposed হলো না,... পৃথিবীর সমস্ত কিছু তো প্রতিক্রিয়াহীন হয় না। সুদূর প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে থাকে। যাই হোক, এভাবে চাষযোগ্য করে তোলার জন্য... কৃষকদের একটা সহজাত বুদ্ধি থাকে কিন্তু... কোন্ মাসে কী করবে... তখন ওদের কোন কৃষিবিজ্ঞান নেই, সরকারি কৃষি দপ্তরও এগিয়ে আসেনি। ওরা নিজের থেকেই, মোটামুটি এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে নানান জাতের ধান, যেমন ধরুন পাটনাই, স্যালাইন রেজিস্ট্যান্স যেটা... সেই চাষগুলি করত এবং প্রধানত ধানচাষটাই করে। দ্বিতীয় ফসল বলে কিছু হতো না। যেটা রবি ফসল— সেটার প্রায় অস্তিত্বই ছিলনা। Predominantly monocrop এবং এই মনোক্রপ হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে সেচের জল নেই। কিন্তু . fallacy হচ্ছে যে জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৭০০ থেকে ১৯০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই জল, বৃষ্টির জল ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। সেটার প্রায় ৯০ পারসেন্ট আবার নদীতে ফিরে যায়। তখন এই সবের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর যে ভাবে বাঁচত, সেটা নতুন সম্পদ-- একটা হচ্ছে মাছ আর জঙ্গলের কাঠ, মধু— এই ধরনের কিছু। প্রধান এবং মূল আয় ছিল, এখনও তাই— সেটা হলো একবারের চাষ। ফলন হতো একরে ১৮ মনের মতো, যদি আপনি হাই-ইল্ডিং না করেন। কিছু কিছু সব্জি, বাড়ির খাওয়ার জন্য, এটা-সেটার জন্য। আমি একটা হিসেব করে দেখেছিলাম আজ থেকে ১৫/২০ বছর আগে। সুন্দরবনে যত ধান উৎপাদন হয়, যদি সুন্দরবনের লোক ৫০০ গ্রাম করে চাল খায়, তাদের স্টেপল ফুড ভাত, চারবেলা ভাত— সকালবেলা পান্তাভাত, দুপুরবেলা দুপুরের ভাত, বিকেলে আবার ভাত, রাত্তিরে আবার ভাত— অতএব যদি ৫০০ গ্রাম চালের ভাত খায়, সেই চাল সুন্দরবনে উৎপন্ন হয় না।

অনীক : তার মানে আধপেটা খেয়ে থাকাটা ভবিতব্য!

তুষার কাঞ্জিলাল : এবং মজাটা হচ্ছে, সুন্দরবনে যে ধান উৎপাদন হয়, সবটা সুন্দরবনের লোকের জন্য থাকে, তা তো নয়। যাদের একটু জমি বেশি আছে, তারা সেইটা বাইরে বিক্রি

করে। কাজেই এই যে বলছি ৫০০ গ্রামে হয়না, ওটা ২০০-৩০০ গ্রামে এসে দাঁড়ায়। মানে দারিদ্র্যটা এই পর্যায়ের। এই অবস্থাতে আপনি প্রাইমারি সোর্স অব ইনকাম যদি শুধু এগ্রিকালচার ধরেন, তাহলে সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি— এসব ইনকাম কী? প্রথম কথা, ওখানে কোন বড়ো শিল্প হবেনা। কারণ বড়ো শিল্প হতে গেলে যে nearness to raw material, nearness to power, nearness to market...

অনীক : এর কোনটাই নেই—

তুষার কাঞ্জিলাল : কোনটাই ওখানে ছিল না এবং আজও ওখানে বড়ো কোন শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। আর যেগুলিকে কুটির শিল্প বলা হয়, যেমন আমরা এককালে ওখানে অনেক তাঁতিকে দিয়ে— মেদিনীপুরের অনেক তাঁতি ওখানে গেছে, তাদের দিয়ে— গামছা অমুক-তমুক তৈরি করাতে আরম্ভ করেছিলাম। একটা গামছার প্রোডাকশন কস্ট ওখানে যেটা হয়, শান্তিপুরে সেটা অর্ধেক।

অনীক : হ্যাঁ, র' মেটিরিয়াল তো বাইরে থেকে আসে—

তুষার কাঞ্জিলাল : অতএব ভায়েবল নয়। এবং অন্য কোন অল্টার্নেটিভও নেই, যেটা ভায়েবল।

অনীক : ইংরেজ প্রথমে যে মনোভাব থেকে গিয়েছিল, তাতে তারা চাষের বাইরে জমিটার অন্য কোন ব্যবহারের কথা ভাবেনি। ফলে অন্য ইউটিলাইজেশন যতদিন না চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আসছে, ততদিন তো হবেনা।

তুষার কাঞ্জিলাল : ইংরেজ চলে যাওয়ার পর আজও যে খুব একটা হয়েছে, এটা ভাবার কোন কারণ নেই। তাহলে vulnerability কোথায় কোথায়? একটা হচ্ছে বাঁধ। একটা হচ্ছে ecological imbalance— আপনি পুরো জঙ্গল হাসিল করে দিয়েছেন, ৫৬ ভাগ জমি। এবং থার্ড হচ্ছে মানুষের বেঁচে থাকার মতো জীবিকা, ন্যূনতম চাহিদাগুলি মেটাবার মতো উৎপাদন এখানে হয় না। এই অবস্থা চলতে চলতে একটা সময়ে সুন্দরবনের ডেভলপমেন্টের কথা কিছু কিছু লোক ভাবতে শুরু করলো। আমি ১৯৬৬ সালের পরে গেছি। আমি তখন কোন অফিস-টফিস দেখতাম না। তখন থানা ছিল সন্দেশখালি। ধামা থেকে সন্দেশখালি... কেউই নেই, it was nobody's land। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই কতকগুলি সামাজিক পদ্ধতি, কতকগুলি অর্থনৈতিক নিয়ম, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিজেরা এক্সপেরিমেন্ট করে করে কিছু উৎপাদন করার চেষ্টা করছে, এরকম এক অবস্থা। শিক্ষা— ফার্স্ট জেনারেশন লেখাপড়া কেউ জানতো না বা প্রয়োজনও মনে করতো না। স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে... এত স্ট্রাগল যে গভর্নমেন্টের এসব কথা ভাবার স্কোপও ছিলনা। কিন্তু একটা সময় এলো... বলা যেতে পারে আজ থেকে ষাট বছর আগে। গোটা সুন্দরবন জুড়ে এডুকেশনটা একটা failed subject হিসাবে দেখানো হয়েছে। তখন যেটা ছিল, গাঁয়ের কোন বড়ো ঘরের ছেলে কলকাতা থেকে বিএ-টিএ পাশ করে গেছে বা ম্যাট্রিক পাশ করেছে, চুপচাপ বাড়িতে বসে আছে— তখন গাঁয়ের লোকেই নিজেরা মাটির দালান করে, খড়ের চাল করে স্কুল বানিয়ে দিত। এবং এই ছেলেগুলি, তারা শিক্ষাদান করতে আরম্ভ করে। এবং এই সময়টা যেটা ছিল, এই যে স্কুল, এই যে শিক্ষা, এটা community participation ধরা হতো, owned by community। এবং তাদের urge ছিল। সমাজের সঙ্গে স্কুলগুলির যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড় ছিল। তার কারণ, ইউজিসি থেকে টাকা আসত না, অমুক জায়গা থেকে টাকা আসতো না, কোথাও থেকে টাকা আসতো না...। আস্তে আস্তে এইভাবে স্কুলগুলি গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। তারপর আস্তে আস্তে গভর্নমেন্ট কিছু কিছু স্কুল অনুমোদন দিতে আরম্ভ করলো। প্রথম দিকে খুবই কম গ্রান্ট দিত। আমি হ্যামিলটনের কথা বাদ দিয়ে বলছি। Hamilton was a different chapter। এবং হ্যামিলটন খুব কম জায়গায়... রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া এবং গোসাবা— এই তিনটে দ্বীপে হ্যামিলটন। তা এখন যেটা দাঁড়িয়েছে, এডুকেশনের একটা হরাইজেনটাল এক্সপ্যানশান হয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বাইশশো ছাত্র, দু'হাজার ছাত্র... এক একটা দ্বীপে তিন/চারটে হাইস্কুল আছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে প্রথম যেটা ঘটলো, গ্রামের লোকের সঙ্গে স্কুলের সম্পর্কটা কমপ্লিটলি ছিন্ন হয়ে গেল। মানুষ ভাবলো, আমার তো আর কিছু করার নেই, সরকার তো দিচ্ছে। চাল উড়ে গেছে স্কুলের, গভর্নমেন্ট পয়সা দিলে হবে। মাস্টারমশাইদের এখন নিয়োগ পদ্ধতি পাল্টে গেছে, আগে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি, তাঁরাই নিয়োগ করতেন। এখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাইরে থেকে সব মাস্টারমশাইরা আসছেন এবং তাঁরা কখনোই ঐ স্কুলের বাইরে গ্রামটাকে চেনার চেষ্টা করেন না।... কোয়ালিটির ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করা হচ্ছে। তার চেয়েও সর্বনাশ, এই যে কনজিউমারিশম, এটা তো গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়েছে। এখন শুধু শহরগুলিতে মাল বিক্রি করে চলবে না। আপনি যদি ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোককে চপ্পল পড়াতে পারেন, তাহলে ভাবতে পারেন ইন্ডাস্ট্রি কী হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, কনসাম্পসান প্যাটার্নটা গ্রামে কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনি সুন্দরবনের একেবারে সুদূর জায়গায় যান, আপনি ডাভ সাবান পাবেন, কলকাতা শহরের যা যা কনসাম্সান গুডস, সব পাবেন। কেউ যদি সমাজবিপ্লব ঘটাতে চায়, পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে cultural revolution precedes social revolution, সাংস্কৃতিক বিপ্লব না হলে সমাজবিপ্লব সম্ভব নয়। আমি যখন প্রথম যাই, তখন সংস্কৃতিটা কী ছিল? মাঠে নানান ধরনের গ্রামীণ খেলা হতো, নিজেরাই প্রত্যেক গ্রামে একটা করে যাত্রার দল গড়ে তুলত। এবং ঠিক করা থাকতো এ রাজা হবে, এ সেনাপতি হবে, এ মন্ত্রী হবে, এ ফিমেল পার্ট করবে। বিষয়বস্তু কী থাকতো? মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি বা রামায়ণ অবলম্বনে কোন গল্প অথবা কোন

পৌরাণিক গল্প। তখনকার দিনে যাত্রায় একজন থাকতো, যাকে বিবেক বলা হতো। সে গান করে মেসেজটা দিতো। আজকের সংস্কৃতি? তিনমাইল হাঁটতে পারবে না। নট্ট কোম্পানী না হয় আর্য কোম্পানীর 'পতিঘাতিনী সতী' এইসব যাত্রা। কলকাতায় সিনেমা-স্টারদের নিয়ে যায়। ভিডিও পার্লার নেই এমন গঞ্জ আপনি পাবেন না। প্রচারমাধ্যম, বৈদ্যুতিন মাধ্যম, খবরের কাগজ... এখন বিজ্ঞাপন মানুষের মন তৈরি করে দেয়। এই যে বিকৃত সংস্কৃতি-মনস্কতা তৈরি করা হয়েছে, তার ফলে মানুষের মধ্যে যে সমাজ-সচেতনতা ছিল, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল, এক ধরনের সামাজিক টিউনিং ছিল, এগুলোর ক্ষতি হয়। স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের একই অবস্থা। মানে ডাক্তার থাকে না, যায় না। ওখানে এক ধরনের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব এবং উচিত। সেটা হলো প্রিভেন্টিভ। আগেভাগে রোগকে আটকে দিতে হবে। যদি কতগুলি টিকা-ইনজেকশন তুমি নাও এবং কতকগুলি পরিচ্ছন্নতা। শুধু যদি আপনি সেফ ওয়াটার খাওয়াতে পারেন, সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, তাহলেই অনেকটা প্রিভেনশন হয়ে যায়। আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করি, কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলটুকু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। পৃথিবীটা একটা গ্রাম হয়ে গিয়েছে। গোটাটাই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির প্রভাব প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। গ্রামের লোকেরাও শিক্ষা পেয়ে কী করবে, কী খরচ করবে, কী স্বাস্থ্যের সুযোগ পাবে, ওটা স্থানীয় মানুষ ঠিক করেনা, প্রাদেশিক সরকারও ঠিক করেনা, কেন্দ্রীয় সরকারও না। ওটা ন্যাচারাল ইকনমির মতো ডিমান্ড ও সাপ্লাই দিয়ে ঠিক করা হয়। এই দিক দিয়ে, সুন্দরবনের যে বসতি, সেটা প্রচণ্ড ভালনারেবল হয়ে গেছে। প্রমাণ, আয়লার পরবর্তী অবস্থা।

অনীক : আয়লা পরবর্তী সুন্দরবন। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

তুষার কাঞ্জিলাল : আয়লা একটা ঝড়। সমুদ্র উপকূলবর্তী যে অঞ্চল, সেই অন্ধ্র উপকূল থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত যে উপকূলটা আছে, এই অঞ্চলটা cyclone prone area। ঝড়-ঝঞ্ঝা এখানে যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। তার কারণটা হচ্ছে, প্রথমে একটা নিম্নচাপ তৈরি হয়। এই নিম্নচাপটা ক্রমে একটা ঝড়ের রূপ নেয়। তারপর সেটা আরো ঘনীভূত হতে হতে উপকূলে এসে হানা দেয়। উপকূল পেরিয়ে স্থলভূমিতে ঢুকে পড়ে এবং পড়ে দিকবদল হয়ে যায়। উপকূল অঞ্চলে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেটা বিরাট একটা দুর্যোগের অবস্থা সৃষ্টি করে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বা যে কোন উপকূল অঞ্চলে। আমি সুন্দরবনে যে ৪০/৪৫ বছর কাটিয়েছি, তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা হচ্ছে যে এই ঝড়ের গতিবেগ এবং ঝড়ের recurrence আগের থেকে বাড়ছে। খুব বেশি না হলেও বাড়ছে। এর গতিবেগ যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে, সেইজন্য ধ্বংসের পরিমাণটাও বাড়ছে। আয়লার আগেও সুন্দরবনে ঝড় হয়েছে, এবং একটা হিসেবে দেখা যায়, গত ৬০/৭০ বছরে প্রায় সাত লক্ষ লোক এই ধরনের ঝড়-ঝঞ্ঝায় মারা গেছে।

অনীক : পশ্চিমবঙ্গে?

তুষার কাঞ্জিলাল : না, বেশিরভাগটাই বাংলাদেশে। আর্ন্তজাতিক আবহাওয়া সংস্থা ঝড়গুলির নামকরণ আগে থেকে করে রাখেন। আয়লা ঝড় হওয়ার আগেই তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল। যেমন আয়লার পরবর্তী যে ঝড়, সিংহলে *মহাসেন*, ঐ ঝড়ের কী নাম হবে, সেটা আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল। শুধু সুন্দরবন উপকূল নয়, পশ্চিমবাংলার প্রায় সাত-আটটা জেলাকে আয়লা ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। এর গতিবেগ এত বেশি ছিল, intensity এত বেশি ছিল। ক্ষতি কী হয়েছিল? ক্ষতি কী হয়েছিল, এটা বুঝতে গেলে আপনাকে একটু গভীরে যেতে হবে। আমি বোধ হয় আগেই বলেছি যে সুন্দরবনের প্রত্যেকটি দ্বীপ (বসতি দ্বীপ), তাকে ঘিরে বাঁধ আছে এবং সুন্দরবনে মানুষের বসতি গড়ে তোলার এক প্রাক্শর্ত ছিল এই বাঁধ গড়ে তোলা। কেননা জোয়ারের সময়ে নদীর জল যে উচ্চতায় থাকে, সুন্দরবনে যেখানে মানুষ বাস করে, সেই দ্বীপগুলি তার প্রায় দু-তিন ফিট নীচে থাকে। এই বাড়তি জলটাকে আপনি যদি আটকাতে না পারেন, তাহলে নদী প্রতিদিন দুবার করে জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে। জোয়ারের জলে প্রতিদিন ভাসলে যা হয়, সেখানে বাড়িঘর হবেনা, কোন ফসল হবেনা, কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে না, উৎপাদন করার সুযোগ থাকবে না, আর সেই কারণে বসবাস গড়ে উঠতে পারবে না। আমরা প্রথমেই যে বোকামিটা করেছিলাম, ইংরেজদের এবং অনাবাসী জমিদারদের ও ভূমি-কাঙাল মানুষদের লোভে, ঐ দ্বীপগুলি যতটা উঁচু হলে মানুষের বাসোপযোগী হতে পারত, তার অনেক আগেই সেখানে বসবাস শুরু করে দেয়। ঝড় প্রাকৃতিক নিয়মে হয়, কিন্তু প্রকৃতি তো এক নেই। আজ থেকে একশ বছর আগে প্রকৃতি যে অবস্থায় ছিল, বিশ্বপ্রকৃতি, বিশ্ব-আবহাওয়া মণ্ডল, তার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই ধরুন, অত্যন্ত জানা কথা, *গ্রিনহাউস এফেক্ট*, পৃথিবী গরম *হচ্ছে* এবং তার ফলে নানান ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকৃতির মধ্যে ঘটে চলেছে। আজকে যে সুন্দরবনে ঝড়ের রেকারেন্স বেড়েছে বা গতি বেড়েছে, এর পেছনে আন্তর্জাতিক আবহমণ্ডলে বা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছে, ঘটে চলছে, তার প্রতিক্রিয়া আছে। এটা *হচ্ছে* বাস্তব এবং ভবিষ্যতে এটা বাড়বে। এটা কমার লক্ষণ খুব বেশি কিছু দেখছি না। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু আন্তর্জাতিক সম্মেলন *হচ্ছে*, আমরা নিজেরা পণ্ডিত লোকরা বসে, সাতদিন-দশদিন ধরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে তর্ক করছি, আবার যে যার জায়গায় গিয়ে যে গ্যাসটা evict করছিলাম, যেটা এমিশন হচ্ছিল, সেটাই চালিয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, আয়লার কথায় আসি। আয়লায় ক্ষতিটা হলো, এই যে নদীবাঁধ বলছিলাম, সুন্দরবনে এইরকম ৩৫০০ কিমি

নদীবাঁধ আছে। আয়লার ঝড়ে ৭৫০ কিমি নদীবাঁধ উড়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ দ্বীপটা open হয়ে গিয়েছিল। যার জন্য ঝড় কোন বাধা না পেয়ে সর্বনাশ বেশি ঘটাতে পেরেছিল। এবং বিরাট অঞ্চল জুড়ে মানুষের প্রাণ, গৃহপালিত জন্তু, বাড়ি, ঘর— ২০ বছরে ধীরে ধীরে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছিল, তা একঘণ্টায় ধুলিসাৎ করে দিয়ে গেছে। মানুষ পথের ভিখিরি হয়ে গেছে। এই ৭৫০ কিমি বাঁধ বাদ দিয়ে, বাকি বাঁধটা বেঁচেছিল এই কারণে নয় যে সেই বাঁধটা খুব পোক্ত ছিল বা সেই বাঁধটা খুব উন্নত মানের ছিল। আদৌ তা নয়। কারণ এই যে এই ধরণের ঝড়ের গতিপথ এঁকেবেঁকে যায়। যেমন আয়লার ঝড় ডায়মন্ডহারবার এসে আঘাত করেছিল। এবং তারপর এদিকে (কলকাতার দিকে) না এসে সুন্দরবনের একেবারে ভিতরের দিকে কতগুলি দ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। গোটা সুন্দরবনটা সমভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা নয়। কিন্তু যেখানে ক্ষতি হয়েছিল, যেমন ধরুন গোসাবা, বাসন্তী... তারপর কাকদ্বীপ থেকে শুরু করে বাকি যে অঞ্চল, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, যেগুলি নদীর কাছাকাছি, জেমসপুর, আরামপুর, দয়াপুর— এই সমস্ত অঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে। সন্দেশখালিও তাই। সন্দেশখালি প্রপারে যে খুব একটা ধ্বংস হয়েছে, তা নয়। কিন্তু এমন অনেকগুলি দ্বীপ আছে, যেগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যাই হোক, আমি যেটা বলতে চাইলাম, এই যে নদীবাঁধের সমস্যা, এটা কিন্তু সাড়ে সাতশো কিলোমিটারের সমস্যা নয়। এটা ৩৫০০ কিলোমিটারের সমস্যা।

এখন আপনাকে একটু ভেতরে ঢুকতে হবে। নদীবাঁধ তৈরি হয়েছিল কেন, তা আপনি জানেন। কিন্তু নদীবাঁধ ভাঙে কেন, কী কারণে নদীতে ভাঙন হয়, এটা নিয়ে অনেক গভীরে যাওয়া দরকার। নদীবাঁধ ভাঙে দুটো কারণে। একটা কারণ হচ্ছে wave-dash— ২৪ ঘণ্টা ধরে বাঁধে একটা ধাক্কা পড়ছে। এবং সেটাকে সে কোনক্রমে সামলে টিকে আছে। কিন্তু কোন একটা ঝড়-জলের সময়ে অতি সহজেই সেটা ভেঙে যায়। সুন্দরবনে বাঁধে যে ভাঙন হয়, তার শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ এই ওয়েভ-ড্যাসের জন্য ভাঙে। বাকিটা ভাঙে স্রোতের কারণে। এই স্রোতের ব্যাপারটা আপনাদের বুঝতে হবে। স্রোতের ব্যাপারটা কী? বঙ্গোপসাগরের মুখ থেকে কয়েকটা বড়ো বড়ো নদী— যেমন গুয়াসাবা, জালিরা, সপ্তমুখী— এরকম বেশ কিছু বড়ো নদী আছে, যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের জল জোয়ারে ঢুকতে আরম্ভ করে। সুন্দরবনের যে কোন বড়ো নদী, ছোট নদী, শাখা নদী, এরা সবাই সমুদ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এই যে বড়ো নদীগুলি তারা নিজেরা একেকটা রিভার সিস্টেম তৈরী করে। অর্থাৎ সেই নদী থেকে আরো অনেক ছোট ছোট নদী বেরিয়ে যায়। যেমন সপ্তমুখী সিস্টেম, গুয়াসাবা সিস্টেম, জালিরা সিস্টেম, বিদ্যা সিস্টেম অব রিভার— এইভাবে অনেকগুলি সিস্টেম। জোয়ারের জল যখন সমুদ্র থেকে ঢোকে, তখন তা ভেসে ভেসে ঢোকেনা, তীব্রগতিতে সেই জল ঢোকে। জল ঢোকাবার জন্য এই নদীতে প্রকৃতি একটা কাজ করে, সেই নদীর তলায় একটা খাল তৈরি করে— চ্যানেল। এই চ্যানেল দিয়ে জোয়ারের জল ঢুকবে এবং আর একটা চ্যানেল তৈরি করে, যেটা দিয়ে ভাটায় জল নামবে। অতএব প্রত্যেকটি নদীর তলাতেই দুটো করে চ্যানেল আছে। এখন ধরুন জোয়ারে একটা পরিমাণ জল একটা নদীতে একটা বিশেষ গতিতে ঢুকছে। হঠাৎ প্রকৃতি সেখানে একটা বাধা তৈরি করলো, একটা অবস্টাকল তৈরী করলো। অসমভাবে পলিমাটি জমা হওয়ার ফলে, খুব বেশি পরিমাণ পলিমাটি জমা পড়ে এই বাধাটা তৈরি হয়। এই যে বাধাটা সে তৈরি করলো, তার ফলে সমুদ্র ঐ নদী দিয়ে আর অত জল ঢোকাতে পারেনা। তখন কী করে সে? তার সামনে বিকল্প পথ আছে— অন্য নদী দিয়ে বেশি জল ঢোকাতে আরম্ভ করে। তার ফলে কী হয়? তার ফলে, যে নদী দিয়ে কম জল ঢুকছে, সেখানে যে খালটা যে পরিমাণে চওড়া হওয়ার দরকার ছিল... প্রকৃতির ইঞ্জিনিয়ারিং একেবারে নিঁখুত ইঞ্জিনিয়ারিং... তার আর অতটা চওড়া, অতটা গভীর হওয়ার দরকার হচ্ছেনা। অতএব সেটা বুজতে আরম্ভ করে। যেখানে বেশি জল ঢুকতে আরম্ভ করেছে, সেখানে যে খালটা ছিল, যে চ্যানেলটা ছিল সে এই বাড়তি জল বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। অতএব তাকে আরো গভীর হতে হবে অথবা আরো একটু প্রশস্ত হতে হবে। এই যে নদীগুলি সুন্দরবনের দ্বীপগুলিকে ঘিরে আছে, তাদের প্রত্যেকেরই এই চ্যানেলগুলো আছে। এই প্রাকৃতিক কারণেই দেখা যায়, কোন সিস্টেম হাইপার-এ্যাকটিভ হয়ে যায়, কোন সিস্টেম হাইপো-এ্যাকটিভ হয়ে যায়। যে সিস্টেম হাইপার-এ্যাকটিভ হয়, সেই সিস্টেমের যে নদীগুলি, তখন তাদের খাল বা চ্যানেল বাড়াতে হয়, অথবা গভীর করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে নদী বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে। সেই কারণে নদীবাঁধ ভেঙ্গে যায়।

অনীক : বাঁধের তলাটা আসলে দুর্বল হয়ে যায়?

তুষার কাঞ্জিলাল : weak হয়ে যায়। সেটার ভেতরে ঢুকে ভেঙে দেয়। আমরা সাধারণ লোকরা যে মনে করি, ভাঙনটা উপর থেকে হয়। না, ভাঙনটা উপর থেকে হয়না। ভাঙনটা নীচের থেকে হয়। এর সঙ্গে আপনাকে মনে রাখতে হবে, এই ভাঙন বন্ধ করার মতো প্রকৌশল বা বিজ্ঞান আজকে পর্যন্ত পৃথিবীতে বেরোয়নি। এই টেকনিকাল স্কিল বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভাইসেস, এই ধরনের ভাঙনকে রোখার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা যায়নি। তাহলে হোয়াট ক্যান বি ডান্? কী করা যায় এবং কী করা হয়? আপনাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেছনে চলে আসতে হবে। এটাকে রিটায়ারড্ এমব্যাঙ্কমেন্ট বলে। আপনাকে রিটায়ার করে আসতে হবে। এমব্যাঙ্কমেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা বলেন, এটা buying time from nature, প্রকৃতি থেকে সময় নেওয়া। আপনি বলতে পারেন, আমি যদি একবার সরে যাই, তাহলে কি ভাঙন বন্ধ হবে? হতে পারে, নাও হতে পারে। দ্বিতীয় রিটায়ারড্

এমব্যাঙ্কমেন্টটাও ভেঙ্গে যেতে পারে। তখনও ঐ একটাই করণীয়, আরও রিটায়ার হয়ে যাওয়া। তাহলে বন্ধ হবে কবে? বন্ধ হবে প্রকৃতির নিয়মে। প্রকৃতি যখন বন্ধ করবে, তখনই একমাত্র এটা বন্ধ হবে। তার আগে বন্ধ করা যায়না।

অনীক : যেখানে জল কমে যাচ্ছে, সেখানে কী আমরা এগিয়ে যেতে পারি বা এগিয়ে যাওয়া হয়?

তুষার কাঞ্জিলাল : আমি হল্যান্ডে চারবার গিয়েছি। আমস্টারডাম এয়ারপোর্ট সমুদ্রতলের ৫ মিটার নীচে। ওরা যে পদ্ধতিগুলি নেয়... যেমন আমি হল্যান্ডের এমব্যাঙ্কমেন্ট পেপার দেখেছি। ওরা ocean স্টাডি করে— oceanology, সমুদ্রকে স্টাডি করা, প্রতি মুহূর্তে নদী থেকে অনেক তথ্য জেনে নিতে হবে-- কী গতিবেগে আসছে, কী পরিমাণ পলিমাটি নিয়ে আসছে, তার অভিমুখটা কোনদিকে, এটাকে প্রোজেক্ট করে দেখা কোথায় গিয়ে জমা পড়বে— ওরা অনেক আগে সেখানে গিয়ে সেই silt-টাকে ধরে তাড়াতাড়ি যাতে জায়গাটাকে উঁচু করে দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশের এমনই পোড়াকপাল যে আজ থেকে দেড়শ বছরের মধ্যে এইরকম কোন সায়েন্টিফিক স্টাডি আজ পর্যন্ত হয়নি। আমাদের দেশে এমব্যাঙ্কমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বলে তো কোন আলাদা ইঞ্জিনিয়ারিং নেই। যিনি ইরিগেশনের ইনজিনীয়ার, তিনি ট্রান্সফার হতে পারেন, যিনি ইলেকট্রিকাল ইনজিনীয়ার, তিনিও ট্রান্সফার হতে পারেন। সুন্দরবন ডেভালাপমেন্ট বোর্ড, তাতে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার গেছেন। তাঁরা সবাই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে গেছেন বা অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে গেছেন। যেমন ধরুন, আয়লার পরে সুন্দরবনে চেষ্টা হচ্ছে বাঁধকে সেফ করার। সেখানে যাদেরকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, তারা কোনদিন নদীবাঁধে কাজ করেনি। এমনিতে তাঁরা প্রখ্যাত সব কন্ট্রাকটর-ইঞ্জিনিয়ার— আমি বলছি না দুর্নীতি হচ্ছে, আমি বলছি এমন সব লোকদের দেওয়া হচ্ছে, যাদের নদী, বাঁধ, সমুদ্র— এইসব সম্পর্কে কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আয়লাকে বুঝতে হলে, আপনাকে এইগুলি বুঝতে হবে।

তবে এ সম্পর্কে একেবারে ভাবা হয়নি তা নয়। ১৯৫০-এর দশকে, বিধান রায় যখন চীফ মিনিস্টার ছিলেন, উনি হল্যান্ড থেকে একটা টীমকে নিয়ে এসেছিলেন। জেনসনের নেতৃত্বে। বলেছিলেন, পুরো ব্যাপারটা দেখেশুনে বলো কী করা যায়। সুন্দরবনের, বিশেষ করে জি-প্লট এইসব অঞ্চলে, মানে vulnerable যে অঞ্চলগুলি, সেইসব অঞ্চলে ওঁরা প্রচুর গবেষণা করে একটা পরিকল্পনা পেশ করলেন। এবং সেই প্ল্যানটাকে বলা হয় NEDCO প্ল্যান। *নেডকো* প্ল্যানের মূল বক্তব্য হচ্ছে, এই সমস্যার দুভাবে সমাধান করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে closed system আর একটা open system। ক্লোজড সিস্টেমটা কী? সমুদ্র থেকে জল ঢুকতে দেবো না। ডাইক (Dyke) করে বেঁধে দেওয়া। সপ্তমুখী এসচুয়ারী, ৫৫ কিলোমিটারের মতো... ডাইক করে দাও। ওদের দেশে যেটা করেছে। ডাইক তৈরি করে., সমুদ্রের জলকে ঢুকতে দেবেনা। তাতে দুটো উপকার হবে। একটা উপকার হচ্ছে, জমি অনেক বেশি পেয়ে যাবে। আগে যেটা দিয়ে নদী বইত, তার চারপাশে জমি পাবে। আর একটা সুবিধে, জল মিষ্টি হবে। আর তো নোনা জল ঢুকতে পারছেনা। অতএব জল মিষ্টি হয়ে যাবে, চাষবাস হবে, উৎপাদন অনেক বাড়বে। এই *নেডকো* প্ল্যানটা... তখনকার দিনেই ৫৫/৫৬ কোটি টাকার এস্টিমেট তৈরি করেছিল। সেটা গ্রহণ করা হয়নি।

অনীক : এই ডাইকটা যেখানে বাঁধা হবে, সে তো একটা/দুটো এসচুয়ারী। তাতে তো সবটা সুন্দরবন নয়, কিছুটা অংশ মাত্র প্রোটেক্টেড হবে!

তুষার কাঞ্জিলাল : এই ৫৬ কোটি টাকা ৭৫ কিলোমিটারের জন্য। সবটাই প্ল্যানে ছিল...। বিধান রায় টেকনিকাল গ্রাউন্ডে আপত্তি করেন নি। উনি টাকাটা কেন্দ্র থেকে আনতে পারেন নি। তার জন্য সেটা পড়ে থেকেছে, shelved হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে এমব্যাঙ্কমেন্ট ইনজিনীয়াররা বুঝতে আরম্ভ করলেন যে ক্লোজড্ সিস্টেমে দুটো বিপদ আছে। একটা বিপদ হচ্ছে যে প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণটা খুবই বেশি। হল্যান্ডের মতো দেশ করতে পারে। আমাদের মতো দেশে প্রথমেই এই পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করা কষ্টকর। দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে, হল্যান্ড যে ডাইক দিয়ে ঘিরে দিয়েছে, পরপর তিনটে ডাইক তারা বানিয়েছে। একটা ভাঙে তো পরেরটা আটকায়, পরেরটা ভাঙে তো আবার একটা। তাতেও দেখা যাচ্ছে, অংকের হিসেবে প্রতি ২০০০ বছরে একবার এই ড্যাম ভেঙে সমুদ্র ঢুকে যাবে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে পারা যায়না। আমাদের এখানে বলা হলো যে, বাঁধ ব্যবস্থাটা ভেঙে গেলে তা গোটা সুন্দরবনটাকে ধ্বংস করে দেবে। দেখা গেল আমি বাঁধ তৈরি করলাম, ৩০...৪০...৫০... বছর পর গোটা এমব্যাঙ্কমেন্টটাই ফেল করলো, ভেঙে গেল।

অনীক : এটার ফলে সুন্দরবনের যে জঙ্গল সেটাও তো নষ্ট হয়ে যাবে!

তুষার কাঞ্জিলাল : তাহলে কী কর্তব্য? এঁরা বলছেন, তোমাকে আগে এনভায়রনমেন্ট স্টাডি করতে হবে। তোমাকে জানতে হবে প্রকৃতি কী চাইছে। এবং তার সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করে, তোমাকে এমব্যাঙ্কমেন্ট পলিসি ঠিক করতে হবে and it must be flexible। প্রকৃতিকে ঘিরে ফেললাম, আর কোনদিন সে জাগতে পারবেনা, এসব ভাবা ঠিক হবেনা। স্টাডি দি নেচার। নদীকে দেখো, সমুদ্রকে দেখো। অবজার্ভ করো। ডেটা কালেক্ট করো, ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি করো। আট-দশ বছরের ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরী করো। করে তারপর সেখানে কী প্রোটেক্টিভ ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তখন সেটা ঠিক করো। এটাই ওপেন সিস্টেম। আমাদের দেশে যেটা করলাম— নদী, সমুদ্র কোনটারই কোন

গবেষণা করা, তথ্যগুলি সংগ্রহ করা, ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি করা, নেচার কী চাইছে, সেটা বোঝা— এটা না করে, এটাকে পুরো বাদ দিয়ে আমরা যা করার তাই করে যাচ্ছি। কোথাও একটু ভাঙন হয়েছে, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলো। রিটায়ার্ড এমব্যাঙ্কমেন্ট করে পিছিয়ে এলাম, নয়তো মাটি দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা করলাম।

অনীক : আপনি আগের দিন বলেছিলেন, এক্ষেত্রে ম্যানগ্রোভের একটা ভূমিকা আছে। প্রাথমিক ধাক্কাটাকে আটকায়।

তুষার কাঞ্জিলাল : প্রকৃতি যখন কিছু তৈরি করে, তার প্রোটেকশনের একটা ব্যবস্থা সে করে রাখে। এই যে দ্বীপগুলি, এটা জানা কথা যে এগুলো সমুদ্রের ঝড়ে আক্রান্ত হবে। প্রকৃতি সে কারণে এক ধরনের গাছ এখানে তৈরি করলেন— এক ধরনের নয়, অনেক species আছে— যারা অনেক বেশি লবণাক্ত জলে টিকে থাকতে পারে। আর এদের শেকড়টা উপরের দিকে উঠে যায়। এই যে বাদাবন দিয়ে *তিনি* সুন্দরবনটাকে ঘিরে ফেললেন— বাদাবন বট-অশ্বত্থের মতো বিরাট বড়ো বড়ো গাছ নয়, bushy টাইপের, সেটারও কারণ হচ্ছে বাঘ বা অন্য জন্তু বট-অশ্বত্থের জঙ্গলে অনেক বেশি ওপেন হয়ে যায়— তারা যাতে শান্তিতে থাকতে পারে এবং intervention from outside যাতে কম হয়, তার জন্য bushy টাইপের ফরেস্ট করলেন। এখন সরকারি চেষ্টা আছে, বেসরকারি চেষ্টাও আছে, দুটো কথা চিৎকার করে বলা আরম্ভ করলো যে আমাদের প্রিন্সিপ্‌ল দুটো হওয়া উচিত— এক, protect the present forest, এখন যতটুকু জঙ্গল আছে, সেটা প্রিজার্ভ করো। আর একটা হচ্ছে, নূতন কোন জঙ্গল, গাছ কাটতে দেওয়া হবেনা। থার্ড হচ্ছে, যতটা বেশি সম্ভব গাছ লাগানো। কিন্তু এখানেও প্রকৃতির মার যে কী জিনিস। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, খুব সম্প্রতি, একটা স্টাডি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্র থেকে জল কম ঢুকছে। তার ফলে নদীতেও কম জল ঢুকছে। এবং নদী থেকে জঙ্গলের মধ্যে যে খাঁড়িগুলো বেরিয়েছে, সেখানেও কম জল ঢুকছে। তার ফলে নদীর জলটা ততটা উঁচুতে উঠছে না। ততটা উঁচুতে না ওঠার ফলে, যে গাছগুলি ওখানে জন্মাত, সেগুলি জন্মাচ্ছে না। নূতন করে সেখানে ফরেস্ট তৈরি হচ্ছেনা। ন্যাচারালি যেটা হওয়ার কথা। যদি পুঁতে দিয়েও আসে, তাহলেও সারভাইভ করছে না। এটা একটা ভয়াবহ অবস্থা। এটা একটা রিসেন্ট স্টাডি। আমরা আশঙ্কিত।

আর একটা দিক দিয়েও শঙ্কিত। কল্যাণ রুদ্র, নদী বিশেষজ্ঞ, ইদানীংকালে একটা কাজ করে বলছেন যে সুন্দরবনের একটা অংশ জলের তলায় ডুবছে, শুধু তাই নয়, মেন ল্যান্ডটাই আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। দ্বীপগুলির আয়তন কমতে আরম্ভ করেছে। এই পার্সপেক্টিভে, আমি ছোট করে বলছি, আয়লা যে ধ্বংসটা করতে পেরেছে, ভবিষ্যতে আয়লা বা তার চেয়েও বেশি সুন্দরবনকে আঘাত করার মতো ঝড় হবে। এদেশে হোক, বাংলাদেশে হোক, ঝড় তাকে আঘাত করবে, এটা আমাদের ধরে নিতে হবে। তাহলে তার থেকে প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য আমাকে একটা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী, দুটো পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। তাতেও সমস্যার সমাধান হবে কিনা, এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর বলা যায়না। কারণ একদল সায়েন্টিস্ট বলছেন, একটা কাজ করো— সুন্দরবনে যে দ্বীপগুলিতে বন্যপ্রাণীরা থাকে, ওদেরকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এখানে আনো।

অনীক : কোথায়?

তুষার কাঞ্জিলাল : এখন যেখানে মানুষ বাস করে। আর মানুষগুলিকে ওখানে নিয়ে যাও। ওগুলো অনেক উঁচু হয়ে গেছে। ওগুলো হ্যাবিটেবল প্লেস। এ তো প্রলাপ বাক্য। আয়লার পরে যেটা আমি দেখলাম, প্রথম অংশ যেটা, সেটা হলো ত্রাণ। প্রথমে শুধু মানুষ, পাশে কেউ নেই। প্রথমে দ্বীপবাসীরা, তারাই আছে। আর কেউ তাদের সাহায্য করার নেই। আগে যে সোশ্যাল বন্ডেজ দেখতাম... এক জায়গায় বাঁধ ভাঙলে সাত গ্রামের লোক দৌড়ে যাবে, অর্থাৎ এটা রক্ষা করার দায়িত্ব যে আমাদেরও এবং এটার সর্বনাশ-ক্ষতি যেটা করবে, আমাদেরই করবে, এই যে বোধটা, আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। That is due to politics, সামাজিক বন্ধনগুলির অবক্ষয়। আগে আমরা দেখেছি, যখন বাঁধ ভাঙতো, ১৫/২০ বছর বয়সী ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়তো। এখন তারা করবে না, তারা তো হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ে। তারা মাঠে কাজ কী করবে। সুন্দরবনের লোকের দিক থেকে যে পরিমাণ সচেতনতা এবং এই দ্বীপকে রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব যে তাদেরই বেশি, এই বোধটা এখনও তাদের মধ্যে তৈরি করা যায়নি। এবং সেটার জন্য মূলত দায়ী কিন্তু পলিটিকস। এখন তো পলিটিকসের মূল কথা হচ্ছে পাইয়ে দেওয়া। পাইয়ে দিয়ে আমার ওপর নির্ভরশীল করে তোল। অতএব এখানেও তাই হয়েছে। আয়লা যেই হলো, তখন প্রথম দিকে ত্রাণের বন্যা বয়ে গেল। অনেকে ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই কাজটা করেছিল... অনেকেই গিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হলো তাদের সেভেন্টি পার্সেন্ট জিনিস জলেই পড়ে গেল। কী করবে তারা? তারা এখান-ওখান থেকে মালটাল সংগ্রহ করলো, করে গদখালিতে গিয়ে একটা নৌকো ভাড়া করেছে। গিয়েই ফিরে আসতে হবে। আর পেশা হয়ে গেল তখন সুন্দরবনের লোকদের ঐ গদখালি থেকে পাঁচ-সাত কিলোমিটার পর্যন্ত নদীর দুধারে দাঁড়িয়ে 'আমরা কিছু পাইনি গো', 'আমরা কিছু পাইনি...'। আর এদেরও তাড়াতাড়ি আছে। মালগুলো সেখানে দিয়ে দিল। কিন্তু সেখানে হয়তো দশবার পেয়েছে। যেখানে ইন্টিরিয়রে দরকার অনেক বেশি, কেউ পৌঁছচ্ছে না। আমি দেখেছি, জলের বোতল দিয়ে এসেছে, সেটা একঘণ্টার মধ্যে গোসাবা বাজারে বিক্রি হয়ে গেল। যেটা উচিত ছিল, সেটা হচ্ছে একটা সেন্ট্রালাইজড কো-অর্ডিনেশন... গভর্নমেন্ট

ডিপার্টমেন্ট হতে পারে। যে যা ত্রাণ আনছে, এখানে জড়ো করো। আমাদের সর্বত্র লোক আছে, পঞ্চায়েত আছে... কোথায় কী ক্ষতি হয়েছে, কোথায় মাল গেছে, কোথায় মাল যায়নি, কোথায় মালের ব্যবস্থা করতে হবে, আমরা সেই ব্যবস্থাগুলি করবো। এটা হয়নি। তারপরে ইমিডিয়েট যে সরকারি সাহায্য, সেটা পৌঁছাতে... এখনও পুরো হয়েছে বলে আমার মনে হয়না। ঘর করার টাকা পাওয়া বা অন্য... সাহায্য কিছু কিছু পেয়েছে, পায়নি তা বলবো না। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট তখন... ফর দি ফার্স্ট টাইম... ইমিডিয়েট স্কিম নিয়ে... ৯ মে বোধহয় আয়লা হয়েছে... ২৫ জুন ওরা একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করলো। টাস্ক ফোর্সে সারা ভারতবর্ষের বিরাট বিরাট বিভিন্ন স্পেশালিস্ট, ইনজিনীয়ার, ব্যুরোক্রাট্স, তাদের দিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স করলো, আমাকেও নিয়েছিল। সেই টাস্ক ফোর্স তিনটে কথা বলেছিল। প্রথমে ক্ষয়ক্ষতিটা নিরূপণ করার চেষ্টা করো। সেকেন্ড হচ্ছে, ইনটেরিম্ প্ল্যান তৈরি করে দেওয়া, প্রাইমারি স্টেজে এক্ষুনি কী কী করা দরকার। এবং ঐ যে ৭৫০ কিলোমিটার নদীবাঁধ ভেঙ্গে গেছে, এটাকে পুরো restore করা। এই ধরনের immediate first phase plan। বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য আনিয়ে একটা ফার্স্ট ফেজ-এর প্ল্যানিং করা হলো। যেটার পিরিয়ড ছিলো ২০০৯ থেকে ২০১৩। এই প্ল্যান পিরিয়ডে খরচ হওয়ার কথা ৫০৩০ কোটি টাকা। তার কাজটা হছে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেন করে, ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশ যে ভাবে করেছে, ইন্দোনেশিয়া যে ভাবে করেছে, অন্যান্যরা যে ভাবে করেছে, সেই স্ট্যান্ডার্ডে... বাঁধটার উপরটা কতটা চওড়া হবে, slope কতটা থাকবে, এ থেকে আরম্ভ করে কী কী দিয়ে তৈরী করা হবে-- ডিটেইলসে ডিজাইন ও প্ল্যানিং করে গভর্ণমেন্টকে দেওয়া হয়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট স্টেট গভর্ণমেন্টকে ৫০৩০ কোটি টাকা দিয়ে দেয়। একটা মাত্র কন্ডিশন ছিল-- ওরা বলেছিল ১০ পারসেন্ট স্টেট গভর্ণমেন্ট দেবে, তারপর বলল যে ২৫ পারসেন্ট দেবে। বাকিটা পুরোটাই সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের। একটা কথা বলে শেষ করছি আমি, ২০০৯ থেকে ২০১৩-এর মধ্যে যেটা হওয়ার কথা ছিল, তার ১০ পারসেন্ট কাজ হয়নি। এবং সেই প্ল্যানে বলা ছিল, এটা কমপ্লিট হলে আমরা সেকেন্ড ফেজ-এর প্ল্যান-টা করবো। সেকেন্ড ফেজ-এর প্ল্যান-টা আরও ব্যাপক। সেখানে এই বিভিন্ন রিসার্চ, বিভিন্ন ডেটা কালেকশন করা, বয়া রাখা... নদীতে অনেকগুলি বয়া থাকবে, সেখানে নানারকম যন্ত্রপাতি থাকবে, ল্যান্ডে কম্পিউটার থাকবে এবং ডেটা কালেকশনের ব্যবস্থা থাকবে। পরে সেটা প্রসেসিং করে একটা full-fledged plan for maintenance of embankment আমাদের করা দরকার। এই সেকেন্ড ফেজ-এ মনে করা হয়েছিল, ১৪০০০ কোটি টাকা লাগবে। তখন। এবং বলা হলো, এই চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা হয়তো সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট-এর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবেনা। আমরা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিগুলিকে এ্যাপ্রোচ করবো, উইথ স্পেসিফিক প্ল্যান এ্যান্ড প্রপোসাল। তো এখন ফার্স্ট ফেজেই ১০ পারসেন্ট কমপ্লিট হলো না। এই কমপ্লিট না হওয়ার দুটো কারণ, যতটুকু বুঝেছি আর কি— একটা হলো এমব্যাঙ্কমেন্ট crest, উপরটা, চওড়া করতে হবে আর দুদিকে ঢাল রাখতে হবে। নদীর দিকে ঢাল রাখতে অসুবিধে নেই, জমি পাওয়া যায়। কিন্তু আইল্যান্ড-এর দিকে যে ঢাল, সেখানে জমি পাবে কী করে?

অনীক : অ্যাকুইজিশন হচ্ছে তো!

তুষার কাঞ্জিলাল : অ্যাকুইজিশন তো হচ্ছে না। হলে তো হয়েই যেতো। তবে অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে এরা নানারকম গণ্ডগোল করছে। প্রথমত, মমতা ব্যানার্জী গিয়ে বললেন, প্রত্যেককে একটা করে চাকরি দেওয়া হবে। সেটা সম্ভব হলো না। তারপর ওরা একটা প্যাকেজ দিলেন। সেই প্যাকেজটা খুব খারাপ নয়। আমাদের সুন্দরবনের মানুষ হিসাবে বলতে পারি— পলিটিকাল লোক হিসাবে নয়— যে it is acceptable। কিন্তু ডিফিকাল্টি হচ্ছে, জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে জমির মালিকই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। জমি অধিগ্রহণের প্রাইমারি কন্ডিশন হচ্ছে যে ক্ষতিপূরণটা জমির মালিকই পাবে। গভর্নমেণ্ট একমাত্র জমির মালিককেই ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে। দেখা যাচ্ছে, জমির মালিক অনেক জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরা ঠিক করেছেন যে একটা ভ্যালুয়েশন করে কমপেনসেশনটা দেবেন। গভর্নমেন্ট বলছে, আমি ২০০৯ সালের ভ্যালুয়েশন অনুযায়ী টাকা দেব। ওরা বলছে, না ২০১১ সালের...। এখন পর্যটকদের যা হামলা, ঐ নদীর ধারের জমির দাম অবিশ্বাস্য হারে বেড়ে গিয়েছে। যে পারছে, একটা লজ করে দিচ্ছে। গভর্ণমেন্ট কমপেনসেশন দিতে চাইছে, ২০০৯ সাল অনুযায়ী হয়তো বিঘেতে ২০ হাজার টাকা, এখন সেই বিঘের দাম হচ্ছে ২৫ লাখ টাকা। প্রশ্নই আসেনা। এই নিয়ে খিটিমিটি... কেউ নিচ্ছে, কেউ নিচ্ছেনা। আর একটা কথা, মেসিনে কাজ হবে। এক লপ্তে জমিটা পাওয়া না গেলে কাজ করার অসুবিধে। মাঝখানে কেউ যদি হাইকোর্ট করে বসে থাকে, মাঝখানে কেউ যদি দিতে রাজি না হয়... এটা একটা কারণ। আর একটা আমার মনে হয়, যে ইঞ্জিনিয়াররা এখানে যুক্ত ছিলেন, আমাদের ঐ টাস্ক ফোর্সের, তারা সবাই রিটায়ার করে গেছেন। নতুন যাঁরা আসছেন, তঁরা ব্যাপারটাই বুঝতেই সময় নিচ্ছেন। আর থার্ড যেটা দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে বাজারে হাওয়া খেলছে, হাজার হাজার কোটি টাকা সুন্দরবনে উড়ে বেড়াবে... নাও ধরো। এই যে এত মারামারি, এত খুনোখুনি, এ তো আদর্শের জন্যে নয়... গোটাটাই তুই খেয়েছিস, আমাকে তখন খেতে দিস নি। এবার আমি খাব, তোকে খেতে দেব না। যারা এতদিন খাচ্ছিল, তারা অতিরিক্ত চালাক। তারা, এখন যারা খাবে, তাদের দলে চলে গেছে। আর নয়, আজ এখানেই শেষ।

অনীক : ধন্যবাদ।

সুন্দরবন: ভৌগোলিক সংকট

কল্যাণ রুদ্র

পশ্চিমে ভাগীরথী-গঙ্গা, উত্তরে পদ্মা আর পূর্বে পদ্মা-মেঘনা- তার মাঝে যে ব-দ্বীপ তার নাম গঙ্গা ব-দ্বীপ। এর আয়তন ৫৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। রাজনৈতিক দিক থেকে খানিকটা অংশ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে, খানিকটা বাংলাদেশে। ভৌগোলিক দিক থেকে এটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। উত্তরে মুর্শিদাবাদের দিকটা পরিণত ব-দ্বীপ (mature delta), মাঝে উত্তর ২৪ পরগণা ও নদীয়ার একটা অংশ নিয়ে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ (moriband delta)। আর সুন্দরবন হলো সক্রিয় ব-দ্বীপ (active delta), যেখানে ভূমি গঠনের কাজটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এই ব-দ্বীপ গঠিত হতে ৭ কোটি বছর লেগেছে। এর নিচে যে শিলাস্তরটি আছে, Archaean শিলাস্তর, তার উপর পলি জমে জমে ব-দ্বীপ তৈরি হয়েছে। এই দীর্ঘ পলিসঞ্চয়ের ইতিহাসের পাশাপাশি সমুদ্র পিছিয়ে গেছে। পলি জমা হয়ে হয়ে sea-face বা সমুদ্রের মুখটা পিছিয়ে গেছে।

১০,০০০ বছর আগে শেষ হিমযুগের অবসান হয়েছে। হিমযুগের সময় সমুদ্রে জলস্তর ১২০ মিটার নিচে নেমে গিয়েছিল। তার পর জলস্তর উঠে সমুদ্র আবার এগিয়ে এসেছে। মোটামুটি ৭০০০ বছর আগে এটি বর্তমান চেহারা নিয়েছে।

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলেও যে ব-দ্বীপ গঠনের কাজ শেষ হয়ে গেছে তা নয়— বড় বড় বন্যার পর সেখানেও পলিসঞ্চয় হতে দেখা যায়। কিন্তু সুন্দরবনে এই প্রক্রিয়া চলছে নিয়ত, প্রতিদিন দুবার করে।

ব-দ্বীপের উত্তরাংশে যে পলি, সেটা নদীবাহিত (fluvial)। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি নদী ও সাগরের যৌথ প্রক্রিয়া (fluvio-marine)। ব-দ্বীপের মানচিত্রের দিকে তাকালে চোখে পড়ে এখানে অসংখ্য শাখা নদী, সমুদ্রের উপকূলভাগ অত্যন্ত ভাঙাচোরা— পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত ২০০ কিমি বিস্তৃত।

যে এলাকাটাকে আমরা সুন্দরবন বলি সেটা স্পষ্টত দুভাগে বিভক্ত। উপকূলের মানচিত্রে একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে গঙ্গা মোহনার দিকটা পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র মোহনার চেয়ে বেশি দক্ষিণে। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে এমন একটা বৈশিষ্ট্য কিছু ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ঐ পূর্বদিকে মোহনা দিয়েই তো মূল জলস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানেই তো জমি গঠনের কাজটা বেশি এগিয়ে আসার কথা ছিল।

ঐতিহাসিকদের অনেকে বলেন যে গঙ্গার মূল স্রোত আগে এদিকেই (ভাগীরথীতে) ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় কারণটা এই যে নিচের শিলাস্তরটি পূর্ব দিকে হেলে আছে, ফলে সেদিকে ভূমি গঠন করতে অনেক বেশি পরিমাণ পলি প্রয়োজন হয়েছে। তাই ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিম দিকে পলিস্তরের গভীরতা মাত্র ৩০০ মিটার, যেখানে পূর্ববাংলার দিকে তা ২২০০০ মিটার। এছাড়া, আর একটা ঘটনা ব-দ্বীপের গঠনকে প্রভাবিত করেছে। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা সিলেট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ওটা একটা বেসিন। ফলে ওটাকে ভরাট করতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে। তার ফলে সমুদ্র উপকূলে পলি এসেছে অনেক পরে।

এই বৈশিষ্ট্যটা মাথায় রেখে আরেকটা আলোচনায় যাই। হুগলী ও পদ্মা-মেঘনার মোহনা ধরে যে পরিমাণ পলি উপকূলে জমা হয় তার পরিমাণ বছরে প্রায় ১০০ কোটি টন। এটা একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। গত ২০০-২৫০ বছরে উপকূলে বিবর্তনটা আমরা জানতে পারি, কারণ ১৭৮০ সালে জেম্‌স রেনেলের মানচিত্রটাই এ অঞ্চলের প্রথম প্রামাণ্য মানচিত্র। এই মানচিত্রের জন্য সার্ভেটা করা হয়েছিল ১৭৬৪-৭৭ সালে। ফলে ঐ মানচিত্রটা ঐ সময়ের অবস্থা দেখাচ্ছে। ঐ মানচিত্রের সঙ্গে আধুনিক উপগ্রহ-চিত্র মেলাবার চেষ্টা করে দেখেছি, নতুন উপকূল তৈরি হয়নি, বরং সমুদ্র এগিয়ে এসে উপকূল খানিকটা দখল করে নিয়েছে। হুগলী নদীর মোহনায় সাগরে সমুদ্র ১২-১৩ কিমি এগিয়ে এসেছে। গত এক শতাব্দীর মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে উপকূল বরাবর ৪২০ বর্গ কিমি সমুদ্রে চলে গেছে। অর্থাৎ, সাগর এগিয়ে আসছে, উপকূল রেখা পিছিয়ে আসছে।

এটাকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। জনপ্রিয় ব্যাখ্যা হলো, ভূ-উষ্ণায়ণের ফলে সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠে উপকূল গ্রাস করছে। প্রথম বিশ্বের মানুষের বিলাসী জীবনযাপন সুন্দরবনের মতো সমুদ্র-উপকূলবর্তী নিচু জমির মানুষদের জীবনে ডেকে আনছে বিপর্যয়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, বঙ্গোপসাগরের মোহনায় গড়াই নদীর মোহনার কাছে একটা সামুদ্রিক খাত আছে— Swatch of No Ground (SNG)। কিছু ভূতাত্ত্বিক মনে করছেন, এই খাতটি দিয়ে প্রচুর পলি গভীর সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। তৃতীয় ব্যাখ্যাটি হলো, ব-দ্বীপে প্রতিদিন পলিসঞ্চয় হচ্ছে, কিন্তু ওপরের পলির চাপে নিচের পলি ক্রমশ জমাট বাঁধছে। যে পলি জমা হচ্ছে, তার চাপে নিচের পলি আরো নিচে বসে যাচ্ছে। ব-দ্বীপ তখন বাড়বে যখন পলি জমার হার (rate of accretion) ভূমির অবনমনের হারের (rate of subsidence) চেয়ে বেশি হবে। এক্ষেত্রে ভূমির অবনমনের হারটাই বেশি।

নিচের যে শিলাস্তরটির কথা বলেছি তাতে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত একটা রেখা বরাবর শিলাস্তরের ঢাল বদলে গেছে। দক্ষিণ-পূর্বের অংশটি subsiding trough, উত্তর-পশ্চিমের অংশটি স্থিতিশীল অংশ (stable self zone)।

হয়তো বা সবগুলি কারণই কমবেশি কাজ করছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, যে মোহনায় সবচেয়ে বেশি পলি জমা পড়ছে, সেখানে নতুন উপকূলভূমি গড়ে উঠছে না।

ঐতিহাসিকরা সুন্দরবনের গভীরে নানা পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পেয়েছেন, যার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় যখন ইউরোপীয়রা এলো, তখন সুন্দরবন জঙ্গলে ঢাকা, বিস্তীর্ণ অংশ জোয়ারের সময়ে জলে ঢেকে যায়। এমন এলাকায় মানুষের বসতি সম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, তবে কীভাবে গড়ে উঠেছিল ঐ বসতি? অনুমান করা হয়, ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এক প্রবল ভূমিকম্পের ফলে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা অবনমিত হয় এবং সাগর এগিয়ে এসে বসতি এলাকা প্লাবিত করে দেয়। ক্যানিংয়ে পুকুর খোঁড়ার সময় মাত্র ১০ ফুট নিচে সুন্দরী গাছের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গাছগুলি খাড়া দণ্ডায়মান। তার থেকে মনে হয় হঠাৎ করে subsidence হয়েছিল। শিয়ালদা অঞ্চলেও মাটির নিচে সুন্দরীগাছ দেখা গেছে। রেনেলের ম্যাপে বলা হয়েছে, বাখরগঞ্জের কাছে— "This country was depopulated by Mugs."

আর একটা বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের ভূমি গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি অষ্টাদশ শতক থেকে বিঘ্নিত হচ্ছে। পশ্চিম দিকটায় নদীগুলোকে যখন বাঁধ দিয়ে বেঁধে প্লাবনভূমির সঙ্গে নদীর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো, ভূমি গঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হলো। ফলে নদীখাতেই পলি সঞ্চিত হতে থাকল। ভরা জোয়ারের সময় এখন নদীর জল তার পাশের জমির থেকে ১$^1/_2$-২ মিটার ওপরে থাকে। জঙ্গল এলাকায় কিন্তু ভূমিগঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত। সেখানে নদী প্রতিদিন পলি সঞ্চয় করে চলেছে। তার ফলে এখন জঙ্গল এলাকার জমি বসতি এলাকার জমির চেয়ে অন্তত ২ মিটার উঁচুতে। আয়লার সময় দেখা গেছে, বসতি এলাকায় যেখানে জল নামতে ২-৩ সপ্তাহ লেগে গেছে, জঙ্গল এলাকা থেকে পরের দিনই জল নেমে গেছে।

আসলে আয়লা একটা শিক্ষা দিতে চাইছে। নদী তার প্লাবনভূমি ফেরত চাইছে। উত্তরাখন্ড থেকে সুন্দরবনের আয়লা— নদী তার প্লাবনভূমি, যা হয়ত সে শতাব্দীতে একবারমাত্র ব্যবহার করবে— তা ফেরত চায়। বিশেষ করে সুন্দরবনে জোয়ারের আর ভাটার মাঝামাঝি (inter-tidal zone) যে জায়গাটা, সেটা নদীকে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। অর্থাৎ নতুন বাঁধ নির্মাণের সময় সেটা পিছিয়ে নিতে হবে। অথচ বাঁধের কাছাকাছি এলাকাতেই সবচেয়ে বেশি মানুষের বসতি।

সুন্দরবন নানা ভৌগোলিক সমস্যায় জর্জরিত; যেমন:

এক, সমুদ্র এগিয়ে আসছে।

দুই, দুটি বাঁধের মাঝখানের নদীখাত বুজে যাচ্ছে।

তিন, উজানের নদীগুলো যে মিষ্টি জল সরবরাহ করত, তার জলও কমে যাচ্ছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র নির্ভর করে লবণাক্ত ও মিষ্টি জলের মিশ্রণের ওপর।

আয়লার পরে যে পুনর্নির্মাণের কাজ হয়েছে তাতেও কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করা হয়নি। নদীর দিক থেকে মাটি তুলে বাঁধের পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে এই বাঁধ সুন্দরবনকে সুরক্ষা দেবে না।

সমাধান কী? সমাধান কঠিন। প্রথমত, নদীকে আরো অনেকখানি জায়গা ফিরিয়ে দিতে হবে। সেটা করতে গেলে বহু মানুষকে অস্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দিতে হবে। সামগ্রিক একটা ভূমি ব্যবহার নীতি গঠন করতে হবে সুন্দরবনের জন্য। কোন এলাকা বসতির যোগ্য আর কোনটা নয়, সেটা নির্ধারণ করতে হবে। নদীর পলি যদি প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে দিতে না দিই, নদীগুলো বুজে যাবে।

ফলে একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজটা করতে হবে। ওখানকার hydro-ecology— জলস্রোত, জোয়ারভাটা ও বাস্তুতন্ত্রের আন্তঃসম্পর্কের সূত্রগুলি বুঝতে হবে। প্রকৃতির সাথে সংঘাত নয়, তার সাথে সহাবস্থানই সুন্দরবনের অস্তিত্বের শর্ত।

অনুলিখন: সুমিতা

উত্তরাখন্ডের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়

৭ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ মানুষকে 'উন্নয়ন'-এর ভাঁওতা দিয়ে। পাহাড়ের ধাপগুলোয় বিপজ্জনকভাবে জনবসতি বেড়ে চলেছে, বিপুল পরিমাণ জঙ্গল কেটে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। নদীর তীর, প্রত্যন্ত পাহাড়ি গ্রাম— সবকিছুই আজ উন্নয়নের এই করাল গ্রাসে। হরেক কিসিমের ট্যুরিস্টদের খুশি করতে তৈরি হয়েছে নানান স্তরের নানান দরের হোটেল আর রেস্ট-হাউস। আঞ্চলিক বাসিন্দাদের স্বনির্ভর, দেশজ জীবনযাত্রার সর্বনাশ করে দিয়ে (কৃষি ও অন্যান্য কাজকর্ম) তাদের মরশুমি ট্যুরিজ্‌ম ব্যবসার মুখাপেক্ষী করে তোলা হয়েছে, এক রকম জবরদস্তিই। ফলত, স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনীতি পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে এবং বাসিন্দারা অর্থনৈতিক অস্থিরতার নিরুপায় শিকারে পরিণত হয়েছেন। আর এই সাম্প্রতিক দুর্যোগে তাঁদের যে বিপুল দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হলো—আর্থিক, শারীরিক আর মানসিক— তার হিসেব কি কেউ রাখছে?

তাই আজ এক অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন বিধ্বস্ত ওই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি প্রতিরোধ করতে হবে এই অবস্থা সৃষ্টিকারী কারণগুলোরও। নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির করাল গ্রাসে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে সমগ্র হিমালয় ও দেশের নদী-জল-জঙ্গলকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে সুস্থ-সমাজকামী সমস্ত মানুষকে।

সমু

সুন্দরবন ও সুন্দরবনের মানুষ

অরিজিৎ

সুন্দরবন, বাংলার দক্ষিণতম ভূখণ্ড— গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র আর তার অজস্র শাখা নদী উপনদী যুগ যুগ ধরে বয়ে আনা পলি দিয়ে গঠিত। ক্লান্ত নদীর জটিল বিন্যাস মোহনার মুখে দুর্বল হয়ে পড়ে, জোয়ারের জল তার থেকেও বেশি শক্তিশালী হওয়ায় নদীর মুখেই সেই পলিকে নিক্ষেপ ক'রে গড়ে তুলেছে এই বাদাবন; যুগ যুগ পলির ব্যাপক যোগান এ অঞ্চলকে করেছে সমৃদ্ধ এবং আরো দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তর প্রান্তের নির্মাণকে স্থিতিশীল করে দক্ষিণে এগিয়ে গিয়েছে বিনুনি আকৃতির নদী-দ্বীপের গতিশীল ভারসাম্য।

ম্যানগ্রোভ অরণ্য আর শ্বাপদসঙ্কুল এই ভাটির দেশের মনুষ্যসভ্যতার ইতিহাস সুপ্রাচীন, দুহাজার বছরেরও বেশি। দুই বাংলার বাখরগঞ্জ, যশোর আর ২৪ পরগণা জেলার বেশিরভাগ অংশ নিয়ে তৈরি এই ভূখণ্ডের সিংহভাগ এখন বাংলাদেশের অধীন। ২৫,৫০০ বর্গকিমি-র মধ্যে ৯৬৩০ বর্গকিমি পশ্চিমবাংলায়। পশ্চিমবাংলার মোট ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মানুষ বসবাস করে, আর বাকি ৪৮টি দ্বীপ সংরক্ষিত বনভূমির আওতায়। উত্তরে ডাম্পিয়ার-হজেস লাইন, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলী নদী আর পুবে কালিন্দী ইচ্ছামতী দিয়ে সীমাবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন। ২৪ পরগণার ১৬টি থানার ১৯টি ব্লক এর অন্তর্গত। ৪৫০০ বর্গকিমি জনপদে আছে মোট ১০৬৪টি গ্রাম। অপরিণত দ্বীপের চারদিকে মাটির বাঁধ দিয়ে নদীর নোনাজলকে আটকে গোটা দ্বীপের জঙ্গল হাসিল করে গড়ে উঠেছে এই জনপদ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় জোয়ারের জলের উচ্চতা দ্বীপগুলির উচ্চতার থেকে বেশি আর জনমানবহীন দ্বীপগুলোয় জোয়ারের জল ঢুকে পড়ে প্রায় দু-তিন কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত। বসতিপূর্ণ দ্বীপগুলোতে জলের এই চাপকে রক্ষা করে সুন্দরবনের রক্ষাকবচ— নদীবাঁধ।

অতীত ইতিহাস

সুন্দরবনে সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে দুহাজার বছরেরও আগেকার। মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় আলেকজান্ডার আগমনের কালে অর্থাৎ ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিম্নগাঙ্গেয় সভ্যতাকে গঙ্গারিডি সভ্যতা বলে বর্ণিত হয়েছে। পৌণ্ড্রজাতি ও পৌণ্ড্রদেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে প্রাচীন সাহিত্যে। এমনকী বৈদিক ভাষ্যগুলিতেও। অশোকের শিলালিপিতে পৌণ্ড্রনগরের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে; হিউএন সাঙ নিজে এসেছিলেন পৌণ্ড্রদেশে, রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনকে (অধুনা পাবনা) বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনাও করেছেন। পিয়ালী বিদ্যাধরী নদীর চর ধোসা-চন্দনেশ্বর এলাকায় মৌর্য পরবর্তী বৌদ্ধ বিহারের নিদর্শন মিলেছে, সাথে উদঘাটিত হয়েছে উৎকৃষ্ট গ্রামীণ সভ্যতা। হাড়োয়া থানার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নবস্তু মিলেছে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যভাগের। মণি নদীর অববাহিকায় পালযুগে তৈরি জটার দেউল সুন্দরবনের প্রাচীনত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনগাথা, উৎসব— যার অবশিষ্টাংশ আজও সুন্দরবনের জীবনযাত্রায় মিশে আছে। বুদ্ধপূর্ণিমা পালন, ধর্মঠাকুররূপী বুদ্ধ এবং শৈবতীর্থগুলির মঠবাড়ি নামে পরিচিতি তারই নিদর্শন; যা পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্যে। ব্রাহ্মণ্যবাদী লক্ষণসেনের তাম্রশাসনেও পাওয়া যায় এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণকে জমিদানের সাক্ষ্যপ্রমাণ। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতকে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে হঠিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্র জনগোষ্ঠী ও নবাগত ইসলাম শক্তির প্রচেষ্টায় কৃষি এবং বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। পীরগাজীদের গান, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, কেচ্ছাকাহিনীগুলোতে সুন্দরবনের লোকজীবন আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে থাকে মগ আর পর্তুগিজরা, ষোড়শ শতক থেকেই হার্মাদদের লুণ্ঠন শুরু হয়। সাগরদ্বীপ, ময়দা, কুলপীতে এদের শক্ত ঘাঁটি তৈরি হয়। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের অবসানের পর থেকে তাদের দৌরাত্ম্য চরমে পৌঁছায়। পরবর্তী দেড়শো বছরে এদের তাণ্ডবলীলায় দুই বঙ্গের সুন্দরবন কার্যত জনহীন হয়ে পড়ে। নতুন জনপদ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রেনেলের মানচিত্রে এই অঞ্চলকে 'মগদের অত্যাচারে পরিত্যক্ত জনহীন দেশ' বলে চিহ্নিত করা আছে।

নতুন জনপদের ইতিহাস

সুন্দরবনের বর্তমান জনপদের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয় বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হওয়ার পর। ২৪ পরগণার দেওয়ানি লাভ ক'রে ব্যাপকভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হলো জঙ্গল হাসিল করে ব্যাপকভাবে আবাদ করার। ১৭৭০ সালে কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেল জঙ্গলের জমি ব্যক্তিবিশেষের হাতে লিজ আকারে দেওয়ার পরিকল্পনা নেন। শর্ত হয়, প্রথম সাত বছর কোনো খাজনা থাকবে না এবং পরবর্তী বছরে জমির উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে খাজনার হার ঠিক করা হবে; প্রতি দশ বছরে জমি জরিপও করা হবে— যা রাজস্বের নির্দিষ্টকরণের অন্য মাপকাঠি। কিছু মুসলিম ও ইউরোপীয় থাকলেও মূলত বর্ণহিন্দুরাই ইজারা গ্রহণ করেন এবং জঙ্গল হাসিলে নামেন। এই উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ার সাথে সাথেই ১৭৮৩-এ যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট হেঙ্কেল নতুন উদ্যোগ নেন যা 'সুন্দরবন প্ল্যান' নামে

পরিচিত। জমিকে খণ্ড করে রায়তদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়; তারা জমিকে কৃষিযোগ্য করে তুলবে এবং কৃষিজমি থাকবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। জঙ্গল সংলগ্ন জমিদারদের জমির সাথে যাতে গোলযোগ না বাঁধে তার জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে জমিদার ও রায়তদের জমির সীমা নির্দিষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে গোলযোগ বাধে সেখানেই। জমিদারদের জমির সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। জমিদাররা দক্ষিণে নিজেদের এলাকা জোর করে সম্প্রসারিত করে। আর বাধে গোলযোগ। লোক লাগিয়ে রাতারাতি ধান লুঠ করা কিংবা বাঁধ কেটে দিয়ে জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেওয়ার মত কাজ করেছিল জমিদাররা। বহু জায়গায় এহেন ঘটনায় কৃষকরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়। কৃষিজাত পণ্য বাণিজ্যের জন্য হেঙ্কেল সাহেব তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। তার মধ্যে একটি ২৪ পরগণার কালিন্দী নদীতীরে অবস্থিত; লোকমুখে যেটি হিঙ্গলগঞ্জ (হেঙ্কেলগঞ্জ) নামে পরিচিত। কিন্তু এই উদ্যোগও ফলপ্রসূ হয়নি। কালিদাসপুর, চাঁদখালি, মহম্মদাবাদের মত সম্ভাবনাময় কেন্দ্রগুলিও ব্যর্থ হয়। জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। সীমা সংক্রান্ত সমস্যা, খাজনা দিতে না পারা ইত্যাদিই মূল সমস্যা হয়ে ওঠে। ফলত বোর্ড অফ রেভিনিউ উদ্যোগ নেয় জমি জরিপ ও সীমানা নির্দিষ্টকরণের। ১৯১৪তে দুই ভারতীয়, ১৯১৬তে স্যার স্মিথ এবং অবশেষে ১৯২২-২৩ সালে স্যার প্রিন্সেপ যমুনা থেকে হুগলী নদী পর্যন্ত গোটা বনভূমির জরিপের কাজ শেষ করেন। মরিসনের তৈরি ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে ঐ সময়ই ২৩৬টি খন্ডে ভাগ করা হয় সুন্দরবনকে। সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত *লট* পদ্ধতির জরিপের প্রবর্তন হয় তখন থেকে। ১৮২৮-৩২ জরিপের মাধ্যমে সার্ভেয়ার জেনারেল ডাম্পিয়ার ও হজ সাহেব সুন্দরবনের উত্তর সীমা নির্ধারণ করেন— যেটি ডাম্পিয়ার-হজেস লাইন নামে পরিচিত।

হেঙ্কেল সাহেব প্রবর্তিত নীতির ওপর নানান পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে ঐ পর্যায়ে। জমি জরিপের সাথে সাথে নতুন নীতি তৈরি হল ১৮২৯ সালে। শর্ত হলো : ১) নতুন জমি ২০ বছরের জন্য খাজনাহীন হবে; ২) গ্রান্ট নেওয়া জমির অন্তত ১/৪ অংশ পাঁচ বছরের মধ্যে আবাদি করে তুলতে হবে; ৩) কৃষি ভিন্ন বসতি স্থাপন বা উন্নয়নমূলক রাস্তাঘাট বা বাঁধ যে জায়গার ওপর নির্মিত হবে তা রাজস্বমুক্ত হবে; ৪) কুড়ি বছর পর থেকে ক্রমবর্ধমান হারে খাজনা নেওয়া হবে। নতুন নিয়মে দেখা গেল কলকাতাবাসী ইয়োরোপীয়রা বেশি উৎসাহী হয়ে দরখাস্ত করেছে। পাঁচ বছরের শর্তপূরণ করতে না পারা, মূলধনের অভাব এবং সতর্কতা বা যত্ন না থাকায় আবার এই নীতি সার্বিকভাবে ফলপ্রসূ হল না।

এতবার ব্যর্থতার পিছনে বড় সমস্যা ছিল জঙ্গল হাসিল করা। ইজারাদাররা কোনোকালেই জমিতে আসতেন না। তারা সাব-লিজ দিতেন চকদার, তালুকদারদের। যশোর, খুলনার নমঃশূদ্র কাঠুরে, ২৪ পরগনার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মেদিনীপুরের মাহিষ্য এবং নিম্নবর্গের মুসলমানদের এরা নিয়োগ করত জঙ্গল হাসিল করতে। এমনিতেই ম্যানগ্রোভের বৃদ্ধি খুব দ্রুত এবং বাড়েও মাটির তলায় থাকা শিকড়ের মাধ্যমে। তাই কেবল ডালপালা কাটলে হয় না, একেবারে উপড়ে ফেলতে হয়। আর হাসিল করা জমি চাষ না করে ফেলে রেখে দিলে এক বছরের মধ্যে জঙ্গলে ভরে যায়। কাজটি কষ্টসাধ্য এবং দ্রুত করতে হয়। অন্তত পরের দশ বারো বছর টানা চাষ করলে মাটি নরম হয়। তারপর লাঙল চালানো যায় এবং ম্যানগ্রোভের আশঙ্কাও বন্ধ হয়। ফলত দ্রুততার সঙ্গে গোটা দ্বীপটাকেই হাসিল করে ফেলতে হয়। এর সাথে আছে বাঘ আর কুমীরের ভয়। এই কারণগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে সে সময় চকদার, তালুকদাররা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া থেকে শুরু করে রাঁচি, এমনকি সুদূর ছত্তিশগড়ের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজনকে টেনে আনে এখানে। প্রথমত, এরা সাহসী ও কর্মঠ, দ্বিতীয়ত, অল্পে সন্তুষ্ট, তৃতীয়ত, খুবই নিরীহ এবং চতুর্থত, সুন্দরবনের শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াল চরিত্র সম্পর্কে কোনোভাবেই অবগত নয়। এক শ্রেণীর দালাল সম্প্রদায়ের মানুষ নানান প্রলোভন দেখিয়ে আদিবাসী— ওঁরাও, মুন্ডা, ভূমিজ, মালপাহাড়ি ইত্যাদি জাতিগুলিকে নিয়ে আসার কাজ করত। রক্ষণশীল সমাজে ভিটে ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম তাদের ছিল না। এই দালালরা গ্রামের মাতব্বরদের বুঝিয়ে, ঘুষ দিয়ে এগ্রিমেন্ট করত এইসব উপজাতি মানুষের সাথে। সঙ্গে লোভ দেখাত সুন্দরবনের অফুরন্ত রসদের। জঙ্গল কাটলেই আবাদি জমি, ধান, কাঠ, নদীর মাছ-চিংড়ি-কাঁকড়া, জঙ্গলের শুয়োর-হরিণ-গোসাপ। একের পর এক দুর্ভিক্ষ (মনুষ্যসৃষ্ট), জমিদার আর ব্রিটিশের দুর্বিসহ অত্যাচারে যেমন সেসময় সাঁওতাল বিদ্রোহে বিস্ফোরিত হয়েছিল তেমনই ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আদিবাসী কৌম সমাজ। এই পরিস্থিতিতে দলে দলে তারা ভিড় জমায় চা বাগানের পাশাপাশি সুন্দরবনে। যদিও তারা কোথাও জমির স্বত্ব পায়নি, বহুকষ্টে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হয়েছে তাদের। এখনো এই জনজাতির একটা বড় অংশ এখানে অন্যান্য বর্ণের মানুষের সাথে সহাবস্থান করছে।

সিপাহি বিদ্রোহের পরপরই সরকার নতুন নিয়ম আনল। পতিত জমি সরাসরি বিক্রি করে দেওয়া এবং যারা ইতিমধ্যে জমি পেয়েছে তারা জমির খাজনা একবারে দিয়ে জমিতে ব্যক্তি-মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে ১৮৬৩-র ওয়েস্টল্যান্ড রুলস থেকে। প্রথমত, জমির ব্যাপারে স্বত্ব থেকে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা, যা পুঁজিবাদী বিকাশের ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের ইঙ্গিতবাহী এবং দ্বিতীয়ত, সরকার কর্তৃক সুন্দরবনের জমি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। তার সাথে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের তুলনায় ইউরোপীয়দের বেশি করে আকর্ষণ করা। যার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে ১৮৭৯-র **লার্জ ক্যাপিট্যালিস্ট রুলস**। সমস্ত সুন্দরবনকে এই আইনের আওতায় আনা হল। চল্লিশ বছরের হিসেব ন্যূনতম ২০০ বিঘা লিজ নিতে হবে। সঙ্গে মেয়াদ শেষে আরো ত্রিশ

বছর; এক-চতুর্থাংশ খাজনা বিহীন, ১০ বছর পর থেকে, পাঁচ বছরের মধ্যে একের আট অংশ আবাদযোগ্য করে তোলার শর্ত। এই আইনেই হ্যামিলটন সাহেব গোসাবায় ৯০০০ একর জমি পেয়েছিলেন। কিন্তু এই উদ্যোগও বিফলে যাওয়ায় 'নতুন রায়তদারি সেটেলমেন্ট রুল' এবং পরে 'কলোনাইজেশন রুলস'এর মাধ্যমে সরাসরি রায়ত এবং সরকার অধিগৃহীত খাস জমিতে চাষির সাথে রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হল।

পাঁচশালা-দশশালা-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আইন কোনো আমলেই সুন্দরবনের ভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে সুস্থির অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। গত শতকের ত্রিশের দশক অবধি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। জমি স্বত্ব থেকে মালিকানায় পরিবর্তিত হয়েছে, বিক্রির টাকা নিয়ে মুনাফা লুটেছে একাংশ। জন্ম দিয়েছে চকদার, তালুকদারদের মতো একাধিক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর। গরিব কৃষকের নির্ভীক জঙ্গল-হাসিল আর ফসল-ফলানো শ্রমের বেশিরভাগটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে তারা। এর সাথে মুনাফা লুটেছে মহাজন আর ব্যাপারীরা। ফলে চাষের পরে কৃষকের হাতে থাকত যৎসামান্যই।

কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষকদের দুরবস্থা ঘোচানোর জন্য হ্যামিলটনের নেতৃত্বে কো-অপারেটিভ কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবায় সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা অনুযায়ী ধর্মগোলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন চলেছে তার থেকেও বেশিমাত্রায় কৃষকসমাজ লড়াই-এর পথে নেমেছে। ব্রিটিশ প্রভুত্বের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ বিরোধিতায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিতুমীরের নেতৃত্বে লড়াই করেছিল সুন্দরবনের কৃষকরা। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সুন্দরবনের নিয়ন্তাদের বেশিরভাগই ছিল ব্রিটিশের দালাল, একেবারে শেষভাগে এসে তারা স্বদেশি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, ফলত স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বর্ণহিন্দু জোতদার আর নিম্নবর্গীয় শোষিত কৃষকসমাজের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী; তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিরাও মুখোমুখি দাঁড়ানো দুটো পৃথক শিবির। তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত এই প্রেক্ষাপটেই। ১৯৪৮-এ ডোঙাজোড়া, বুধাখালি (হাসনাবাদ-সন্দেশখালি), চন্দনপিঁড়িতে জমিদারদের স্বার্থবাহী কংগ্রেস সরকারের পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ বাধে গ্রামবাসীদের। অহল্যা, বাতাসী, গজেন ভুঁঞা, সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল, সুধীরচন্দ্র ঘোড়াই, ডোঙাজোড়ার কালোবউ— শহিদ হন। পরে তেভাগার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারি-স্বত্ব বিলোপের (১৯৫৫) পর কৃষকদের জমি দখলের আন্দোলন তীব্র হয়। পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনের আঁচ এসে লাগে সুন্দরবনে।

ব্যক্তিহত্যার লাইন ছেড়ে প্রথমে গোলা লুঠ ও পরে জমি দখল ও কৃষকদের মধ্যে বিলি, চাষজমি সংলগ্ন এলাকায় বসতি স্থাপন এবং সর্বোপরি খেতমজুরদের আট ঘণ্টা কাজের অধিকার নিয়ে আন্দোলন ও সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কোনো কোনো অঞ্চলে। মাঠে-মাঠে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে সময় শুরু আর শেষের জানান দেওয়ার প্রক্রিয়া নেয় কৃষকরাই। উল্লেখ্য, ব্যক্তিহত্যাকেন্দ্রিক জনবিচ্ছিনতার রাজনৈতিক লাইন সুন্দরবনের কৃষকসমাজই সজোরে প্রত্যাখ্যান করে।

পরবর্তী দশকে বামফ্রন্টের আমলে সুন্দরবন আবার রক্তাক্ত হয়েছে '৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে; উদ্বাস্তুদের ওপর পৈশাচিকভাবে আক্রমণ চালায় সরকার। পরবর্তী দশকগুলোতে জমির অধিকার, পাট্টা পাওয়া কিংবা জমি টিকিয়ে রাখার উপরই এগিয়েছে আঞ্চলিক রাজনীতি, বেড়েছে দুর্বৃত্তায়ন। দুই ভাইয়ের জমি সংক্রান্ত ঝামেলা হলে তারা আশ্রয় নিয়েছে এলাকার যুযুধান দুটি রাজনৈতিক দলে— বিরোধ রাজনৈতিক রূপ পেয়েছে। এটাই সুন্দরবনের নিত্যদিনের গল্প। সংসদীয় রাজনীতির অন্তর্লীন সুবিধাবাদ একইভাবে মানুষকে দৈনন্দিনতার এক গ্লানিময় জীবনের মধ্যে আটকে ফেলার চেষ্টা করছে। এটা যেমন একটা খারাপ দিক, অপর দিকে মানুষের জীবনের একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত 'রাজনীতি'র যে দাপট তা একটা স্তরে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ইতিহাসের কোনো বিশেষ মুহূর্তে তা ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে।

এই ক্লেদার্থ বর্তমানের মাঝে আলো দেখাচ্ছে কিছু অধিকার আন্দোলন, যা সুন্দরবনের প্রেক্ষাপটেই তৈরি। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে এযুগেও ট্রেডিং-এর জন্য আইন করে কাঠের বাণিজ্য চলেছে, লুঠ হয়েছে জঙ্গলের সম্পদ, বাঘের চামড়া, হরিণের শিং। আর সাধারণ মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সরকার জঙ্গলবাসী মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যাপারে জঙ্গলের সম্পদ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে; আর মাছ চাষ, বন্দর পর্যটন শিল্পের নামে কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিতে চাইছে প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষের আন্দোলন থমকে দিয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎপ্রকল্পের প্রস্তাব, ফিরিয়ে দিয়েছে সাহারাকে, জম্বুদ্বীপে জেলেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

জীবন-জীবিকা : সেকাল থেকে একাল

কৃষি : সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বরাবর কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৭০০ থেকে ১৯০০ মিমি এবং তা হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। নদীর জলে লবণের পরিমাণ বেশি (১.১১% থেকে ২.৩৭%) হওয়ায় তা সেচের অযোগ্য। মাটিও উত্তর থেকে দক্ষিণে উপাদান আর অম্ল ক্ষারের ভারসাম্যের নিরিখে আলাদা রকম। উত্তরে অ-লবণাক্ত বেলে বা দোঁয়াশ মাটি এবং দক্ষিণ দিকে ক্রমশ নোনা হয়ে ক্ষারক-যুক্ত শক্ত এঁটেল মাটি।

প্রাক ব্রিটিশ যুগে ধান বা পাট চাষের উল্লেখ না থাকলেও কুমড়ো, পটল, মুলো, উচ্ছে, শাকসব্জির প্রচলন ছিল। পর্তুগিজদের কর্তৃক অর্থকরী ফলচাষও শুরু হয়। বারুইপুরের লিচু, পেয়ারা বা ময়দা, জয়নগরের সবেদা তারই ধারাবাহিকতা। ১৮৭৩ সালে প্রথম সফলভাবে আলুচাষ শুরু হয়।

ব্রিটিশ শাসিত সুন্দরবনে প্রধান ফসল ছিল ধান। বর্ষায় চাষ হয় আউশ ধান। প্রথম দিকে ম্যানগ্রোভের শিকড় জমিতে থেকে যাওয়ায় তা কর্ষণ করা কষ্টসাধ্য ছিল। বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁশের একটা হাতিয়ারের (কেপি) সাহায্যে মাটিতে ধান পুঁতে দেওয়া হত। এইভাবে দশ বারো বছর চলার পর মাটি আলগা হলে কর্ষণ সম্ভব হত।

সাধারণত কৃষকদের ঘরবাড়ি জমির কাছাকাছি থাকত না। জুন জুলাই মাসে লাঙল, বলদ আর প্রয়োজনীয় খাবার নিয়ে হাজির হত 'আবাদে'। কর্ষণ এবং বীজতলা তৈরি হত তখন। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যখন জল বেড়ে যেত নিচু জমিতে চারা রোপণ করে বাড়ি ফিরে যেত তারা। দিগন্তবিস্তৃত ধানজমি পড়ে থাকত জনমানবহীন হয়ে। ডিসেম্বরে ফিরে আসত ধান কাটতে। ঝাড়াই-বাছাই করে চাল তৈরি করতে করতে জানুয়ারি। স্বত্বভোগী কৃষক ছাড়াও প্রচুর খেতমজুরও শস্যের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত হত সেই আমলেও। এর পরপরই ব্যাপারীরা (ব্যবসায়ী) এসে সেই ধান কিনে নিত নগদ পয়সার বিনিময়ে। জমিদার এবং মহাজনরাও তাদের এজেন্টদের পাঠিয়ে দিত টাকা আদায়ের জন্য। এখানে মাথায় রাখতে হবে, ফসল ওঠার সময় দাম কম থাকে আর তখনই নিয়ম অনুযায়ী চাষীকে সব মেটাতে হত। তৎকালীন রিপোর্ট থেকে যে নামগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো সরু-ধান : ১) রূপশাল, ২) সীতাশাল, ৩) দুধের সর, ৪) চামরমণি; মোটাধান : ৫) পাটনাই, ৬) ট্যাংরা, ৭) নোনাশাল, ৮) চাঁপাকুশি, ৯) কালিন্দী; মুড়ির জন্য : ১০) চন্দ্রকান্ত, ১১) রঘুশাল, ১২) জামাইনাডু; খই-এর জন্য : ১৩) কনকচূড়, ১৪) বিন্নি; পায়েসের জন্য : ১৫) শ্যামা, ১৬) কামিনী, ১৭) গোবিন্দভোগ, ১৮) তুলসীমঞ্জরী। শীতকালীন ধানচাষ হতো, কিন্তু তুলনায় কম।

ব্রিটিশ যুগে অন্যান্য ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কুমড়ো, পিঁয়াজ, লঙ্কা, রসুন, তিল, ডালশস্য, সরিষা, কচু, শাকসব্জী— যা নিয়মিত কলকাতার বাজারে আসতে শুরু করেছিল উনিশ শতক থেকেই। তখন যাতায়াতের একমাত্র রেলপথ ক্যানিং অবধি বিস্তৃত ছিল এবং সুন্দরবনের একমাত্র ক্যানিংয়েই পাকা-রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। অর্থকরী বাগিচা ফসল, পাট এবং পানের বরজেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। জানা যায় নীলচাষের বৃত্তান্ত, যার প্রতীক হিসেবে সুন্দরবনের নানান জায়গায় ভগ্নপ্রায় কুঠিবাড়িগুলো সেই অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়ে যায়।

কৃষির বর্তমান হাল হকিকত

গোটা সুন্দরবন জুড়ে জমিদারি প্রথার অবসানের পর একটা প্রস্থ জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। পুরনো জোতদারদের জমি নামে-বেনামে থেকে গেলেও '৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে কৃষকদের হাতেও প্রচুর জমি এসেছে; পরিবারের খণ্ডীভবনের সঙ্গে সঙ্গে জমিও খণ্ডিত হয়েছে। পুরনো জোতদার, তালুকদাররা আর জমির ওপর নির্ভরশীল নয়, বহুকাল ধরেই তারা শহরমুখী। বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, যাদবপুর, সোনারপুর, বারুইপুর চত্বরে তারা বহুদিন আগে থেকেই ভিড় জমিয়েছে। গ্রামে থেকে গেলে তারা রাজনৈতিক দলগুলোর

আয়ব্যয়ের হিসাব (বিঘাপ্রতি)

বর্ষার চাষ

বীজ : ৭-৮ কেজি ২০ টাকা দরে	২০০ টাকা
বীজতলা : ২টি শ্রমদিন*	৩০০ টাকা
ট্রাক্টর : ৯০ মিনিট, ঘণ্টায় ২১০ টাকা	৩০০ টাকা
রোপন : ৪টি শ্রমদিন*	৬০০ টাকা
নিরানি : ১টি শ্রমদিন*	১৫০ টাকা
সার	৪০০ টাকা
কীটনাশক	১০০ টাকা
ধান কাটা : ৩টি শ্রমদিন*	৪৫০ টাকা
ঝাড়াই : ৭টি শ্রমদিন*	১০০০ টাকা
মোট ব্যয়	**৩৫৫০ টাকা**
আয় : ৯ বস্তা ধানের দাম**	**৫৪০০ টাকা**
লাভ	**২০০০ টাকা**

* শ্রমদিনের যেটুকু নিজের বা পরিবারের শ্রমে করা যাবে তার মূল্য শ্রমদিন প্রতি ১৫০ টাকা করে পরিবারের আয় হবে। নয়ত সেটি খেতমজুরদের কর্মসংস্থান ও আয় হিসেবে গণ্য হবে।

** ৬০ কেজিতে বস্তা, প্রতি বস্তার দাম ৬০০ টাকা।

*** প্রতি বস্তা ধানের দাম ৮০০-১০০০ টাকা

শীতের চাষ

বীজ : ৭-৮ কেজি ৩০ টাকা দরে	২৫০ টাকা
বীজতলার সেচ : ৭০ টাকা দরে ১০ ঘণ্টা	৭০০ টাকা
২ টি শ্রমদিন*	৩০০ টাকা
ট্রাক্টর : ১৫০ মিনিট, ঘণ্টায় ২১০ টাকা	৬০০ টাকা
রোপন : ৪টি শ্রমদিন*	৬০০ টাকা
নিরানি : ২ বার : ২টি শ্রমদিন*	৩০০ টাকা
সার : ২৫ কেজি, ২৫ টাকা দরে	৬৫০ টাকা
কীটনাশক	৫০০ টাকা
ধান বেরোনোর সময় সার : ২০ কেজি	৬০০ টাকা
ভিটামিন স্প্রে	২০০ টাকা
স্প্রে-র মজুরি*	৩০০ টাকা
পুনরায় সেচ: ৭০ টাকা দরে ৪০ ঘণ্টা	২৮০০ টাকা
ঝাড়া ও কাটা : ১০টি শ্রমদিন*	১৫০০ টাকা
মোট ব্যয়	**৯৩০০ টাকা**
১২-১৪ বস্তা ধানের দাম***	**১২০০০-১৪০০০ টাকা**
লাভ	**সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা**

সূত্র: এ বছর গোসাবার চাষি পরিবার থেকে পাওয়া তথ্য

নেতা হয়ে উঠেছে, অর্থাৎ জমির মালিকানার জোরে না থাকলেও নানান ধরনের ব্যবসা, চাকুরি, স্কুল-শিক্ষকতা, সাধারণভাবে সামাজিক প্রতিপত্তি, শহরের সঙ্গে জীবন্ত যোগ ইত্যাদির ফলে গ্রামীণ ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রাজনৈতিকভাবে সেই পরিবারগুলোর হাতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থেকে গেছে। মহাজনী কারবারও নেই, অর্থাৎ পুরনো ধরনের অদ্ভুত শর্তমাফিক ধার দেয় না। যারা ধারের ব্যবসা করে সুদের হার সেখানে বাঁধা থাকে। কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো, এমনকি ভুঁইফোড় অন্যান্য সংস্থাও ঋণ দেয়।

ভাগচাষের থেকেও খেতমজুরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে শেষ দশকগুলোতে। চাষের চরিত্রও বদলে গেছে। বেশিরভাগ জমি একফসলি হলেও সেচের ব্যবস্থা ভালো থাকলে শীতকালীন চাষ সম্ভব হচ্ছে। অগভীর নলকূপ কিংবা বৃষ্টির জল ধরে রাখার জলাধারের মাধ্যমে সেচ সম্ভব হচ্ছে। খাল বা পুকুর খননের লক্ষ্যমাত্রা মাঝে মাঝেই ধার্য করা হয়। ১০০ দিনের কাজে প্রচুর পুকুর খননও হচ্ছে— যদিও তা অপ্রতুল। সারণি অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বর্ষার চাষের তুলনায় শীতের চাষে ফসল বেশি পাওয়া যাচ্ছে। বর্ষার চাষে সাধারণত কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা না থাকলেও জমির সিংহভাগ এখন উচ্চফলনশীল ধান, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, কীটনাশক, রাসায়নিক সারের সাহায্যে চাষ হচ্ছে। শীতের চাষ হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুনভাবে। কৃষকের উদ্বৃত্ত আগে যেমন লুঠ করত জমিদার মহাজনরা, এখন তা নিয়ে যাচ্ছে, বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবসায়ীরা। একাংশ খরচ হয় খেতমজুরিতে। প্রান্তিক বা ছোট চাষীরা, যাদের হাতে অল্প জমি, তারাও খেতমজুরি করে অন্যের জমিতে। সুন্দরবনে জমি বন্ধকের ব্যাপারটিতেও বিশেষত্ব আছে অন্য জেলাগুলোর তুলনায়। হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলে কোনো ব্যক্তি অন্য কারো কাছে টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক রাখে, পরে জমি ফেরত নেওয়ার জন্য আলাদা করে কোনো সুদ দিতে হয় না, মূল টাকাটা ফেরত দিলেই জমি ফিরে পাওয়া যায়। যে বন্ধক রেখেছে সে ঐ সময়টায় জমিতে চাষ করার স্বত্ব পায়, অর্থাৎ চাষের লভ্যাংশটাই সুদ। গোসাবা, বাসন্তী, সাগর, নামখানার ক্ষারযুক্ত নোনামাটি অঞ্চলে এর হার বিঘা প্রতি ১৫০০০ টাকার কাছাকাছি। হঠাৎ প্রয়োজনটাও সাধারণ অসুস্থতা, ছেলেমেয়ের পড়াশুনো, মেয়ের বিয়ে কিংবা আন্দামানে যাওয়ার জাহাজের টিকিট কাটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্য পদ্ধতিটি জমি লিজ দেওয়া। যারা উদ্যোগ নিয়ে চাষ করাতে পারেন না, কিংবা শ্রম নিয়োগের সামর্থ্য নেই অথচ জমি আছে বা প্রচুর জমি আছে, তাঁরা লিজ দেন কৃষকদের। লিজের হার বিঘা-প্রতি বর্ষার চাষের জন্য ২০০০ টাকা, শীতের চাষের জন্য ১২০০ টাকা অথবা বাৎসরিক ৩০০০ টাকা। যারা পারিবারিক শ্রম নিয়োগ করে চাষ করে কেবল তারাই এমন লিজ নিতে পারে, কেননা তা না হলে চাষের খরচ ধান বিক্রির টাকার থেকে বেশি হয়ে যায়। আর পারিবারিক শ্রম না থাকলে নিজে উদ্যোগ নিয়ে চাষ করে যা লাভ হয়, লিজ দিলে না খেটে একই লাভ করা যায় এবং ঝুঁকিও কম।

ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন

কৃষিতে লাভ কমায় জমির ব্যবহারের পরিবর্তনও হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। জমির চারদিকে উঁচু আল দিয়ে নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ির ব্যবসা। দিগন্তবিস্তৃত সবুজবিহীন জল-নির্ভর লাভজনক 'মনোক্রপ' বাগদা চিংড়ির ভেড়ি। সঙ্গে তৈরি হল নতুন পেশা— সুন্দরবনের সমস্ত নদী থেকে দিবারাত্র বাগদার মীন বা লার্ভা ছেঁকে ধরে আনা। ভেড়ি অঞ্চলে অনিচ্ছুক কৃষক কর্পোরেট পুঁজির কাছ থেকে তার জমি রক্ষা করতে পারল না, অভাবী সুন্দরবনের শ্রমজীবী পরিবারের মহিলারা আর শিশুরা নেমে পড়ল মীন ধরতে। এক সময়ে ১০০০ মীনের দাম পেত ২০০০ টাকা অবধি। আবার সেই দাম ১০০ টাকারও নিচে নেমে যেতে দেখা গেছে। কাঁচা পয়সার হাতছানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিবেশ, ধ্বংস হয়েছে বাস্তুতন্ত্র, দুর্বল হয়েছে বাঁধ, ভূমিক্ষয় বেড়েছে, জমি হয়েছে নোনা— যাকে আর চাষযোগ্য করা প্রায় সম্ভব নয়। সরকারও মদত দিয়েছে, কারণ তাতে বার্ষিক রাজস্ব বেড়েছে। লাভ বেড়েছে এলাকার রাজনৈতিক দল ও নেতাদের। ভেড়ি দখলের সাথে বেড়েছে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন— সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও লুম্পেনদের দাপট। দক্ষিণ ভারত থেকে বাগদার মীন আমদানি করায় এলাকায় মীন ধরার কর্মসংস্থানও সঙ্কুচিত হয়েছে। ভেড়িতে মড়ক লাগছে এবং দু-দশক লুঠে খাওয়ার পর লাভের হার কমতে শুরু করছে। পরিত্যক্ত ভেড়ির জমিতে চাষ আর সম্ভব নয়। সে জায়গায় গজিয়ে উঠছে ইটভাটা। মাটি লাশ হয়ে ইঁটের আকারে চলে আসছে নগরায়ণের প্রয়োজন মেটাতে। এ মাটির একটা কণাও ফিরবে না সুন্দরবনে।

ব্যাপক হারে ভূগর্ভস্থ মিষ্টিজল ব্যবহারের ফলে নোনাজল সে স্থান পূরণ করছে। ফলে বাড়ছে পানীয় জলের সংকট। মাটির গুণমান আরও খারাপ হচ্ছে।

অন্যান্য জীবিকা

গ্রামীণ জীবনে কৃষির পাশাপাশি কামার, কুমোর, তাঁতী, নাপিত, ঘরামি, দর্জি, দোকানদার, ফেরিওয়ালা, মুচি ইত্যাদি পেশাগুলো তো সাধারণভাবে হাজির থাকে, সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু নদী জঙ্গল ঘেরা দ্বীপবাসীর জীবনে বিশেষ কিছু পেশা তৈরি হয়েছিল বহুকাল আগে থেকেই। সেগুলো বিশেষভাবে আলোচ্য।

মউলে— যারা জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যায়, সাধারণত জঙ্গলের কাছাকাছি দ্বীপ অঞ্চল থেকে সদলবলে গভীর জঙ্গলে মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহে যায় মূলত বসন্ত থেকে বর্ষার আগে অবধি। দিনে কাজ সেরে বিকেল থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়তে হয়। ৭০ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার চাকে ১০ কেজি অবধি মধু পাওয়া যায়। ১০-১২ জনের দল দিনে একটা, বড়জোর দুটো চাক ভাঙতে পারে। বর্তমানে এর জন্য ফরেস্ট

ডিপার্টমেন্টের অনুমতি নিতে হয় এবং মধুর একাংশ দিনের শেষে সস্তা দরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে আসতে হয়। বাঘের ডেরায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মধু সংগ্রহ করে ফিরে এসে দৈনিক উপার্জন হয় ১০০ টাকার মতো।

বাউলে— সুন্দরবনের কাঠুরে। বর্ষা শেষ হলে ১০-১৫ জনের দল ১৫-২০ দিনের খাবার নিয়ে জঙ্গলে হাজির হয় কাঠ কাটতে। সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, বিদ্যা, রায়মঙ্গলের খাড়িতে কাঠ কাটতে যায় এরা।

জেলে— সবাই জঙ্গলে যায় না। নৌকা আর জাল নিয়ে ভেসে পড়ে নদীতে। জাল খাটিয়ে রাখে কয়েকদিনের জন্য। ধরা পড়া মাছ তাড়াতাড়ি বাজারে পাঠাতে হয়। নদী-পাড়ের জরাজীর্ণ ঘর, প্লাস্টিকের ছাউনি আর নীল বা সাদা জাল শুকাচ্ছে, তার সাথে বাতাসে আঁশটে গন্ধ দিয়েই এদের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বর্তমানে ট্রলারের প্রচলন হওয়ায় বড় মাছ ব্যবসায়ীর শ্রমিক হিসাবে কাজে যুক্ত হচ্ছে স্বাধীন দক্ষ জেলে সম্প্রদায়।

মাঝি— শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, কী দিন কী রাত, জোয়ার-ভাটা— যাত্রী এবং পণ্য পরিবহন করে আসছে এই সম্প্রদায়। নদী পারাপার এবং নদীপথে যাতায়াত কোনোটাই এদের বাদ দিয়ে সম্ভব ছিল না। আজও নেই। কিছু জায়গায় নদীর ওপর সেতু হয়েছে বটে কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নামমাত্র। হাতে টানা নৌকা, তেলো ডোঙার জায়গা নিচ্ছে মোটর চালিত ভুটভুটি কিংবা লঞ্চ। যাতায়াতের জন্য জলপথ ছাড়াও স্থলে পরিবহনের উপকরণ বেড়েছে— অটোরিক্সা, ইঞ্জিনভ্যান, ট্রেকার কিংবা বাস; রেলপথের সম্প্রসারণের প্রস্তাবও এসেছে। ফলে পেশা হিসেবে মাঝিমাল্লারা এখন ক্রমহ্রাসমান।

শিউলি— সুন্দরবনে তাল আর খেজুর গাছ আছে বিস্তর। এই গাঠ কেটে এরা রস আর গুড় তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। শীতের ভোরে এদের দেখা মেলে বাঁশের হাঁড়ি ঝুলিয়ে মেঠো পথে হেঁটে যেতে।

ঘরামি, দেওয়ালি ও কোদালি— মাটির ঘরের দক্ষ দেওয়াল বানানোর কারিগর দেওয়ালি। কোদাল দিয়ে দুদিকে কোপ মেরে বরফি আকৃতির একই সাইজের মাটির চাঙর ভেঙে সেকাজে সাহায্য করে কোদালী, ঘরামি ঘরের ছাউনি বানায়। প্রতিটি কাজেই বিশেষ ধরনের দক্ষতা লাগে।

বেলদার, দফাদার, চাপরাশি— জমিদার আমলে নদীবাঁধ সংক্রান্ত নানান পেশা। বাঁধে মাটি দেয় বেলদার। দফাদার মাটি কাটা পর্যবেক্ষণ করে। চাপরাশি নদীবাঁধের খোজখবর রাখে। সিস্টেম বদল হলেও বাঁধ রয়ে গেছে পুরোনো রকমের, বেলদার পেশাটি সরকারি পদ হয়ে গেছে।

পাল্কিবাহক— পেশাটি আজও সুন্দরবনে অদ্ভুতভাবে টিকে আছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে পাল্কির এখনো ব্যাপক প্রচলন আছে সুন্দরবনের নানান জায়গায়। এগুলোর পাশাপাশি পাখি-শিকারি, কাঁকড়া-শিকারি, ডোঙারে, বাঁধালি ইত্যাদি বিশেষ পেশাগুলো আছে, তবে লুপ্তপ্রায়।

প্রাচীন পেশাগুলোর বেশিরভাগটাই জঙ্গলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের ভয় সরকারি আইন, জঙ্গলে ঢোকার বিধিনিষেধ— তার থেকেও বেশি ভয় বাঘ। এখনো গোসাবা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, নামখানা, কুলতলীর নানান জায়গায় মউলে, বাউলে, জেলেদের গ্রামের কাছাকাছি বিধবাপাড়া দেখা যায়—যাদের পরিবারের এক বা একাধিক পুরুষ জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেনি। ইলেকট্রিক শক দেওয়া মানুষের মূর্তি, মাথার পেছনে মুখোশ পরে বাঘকে বোকা বানানোর নানান কৌশল মানুষ নেয়। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে দক্ষিণরায়, বনবিবি, নারায়ণী, শা-জাঙ্গুলী, বড়খাঁগাজী, কালুরায় ইত্যাদি নানান লৌকিক দেবদেবীর পুজো দিয়ে জঙ্গলে যায় এই বিশ্বাস নিয়ে যে এরাই জঙ্গলে যেকোনো বিপদে তাদের রক্ষা করবে।

আজকের জীবনজীবিকা

বিশ্বায়নের যুগে পুরনো পেশাগুলোর অনেকটাই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনেকগুলি আধুনিকীকরণের মাধ্যমে টিকে গেছে। তৈরি হয়েছে নিত্য নতুন পেশা। এক্ষেত্রেও আমরা আলোচনা করব আজকের দিনে সুন্দরবনের বিশেষ পেশাগুলো।

ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন সুন্দরবনের প্রকৃত উন্নয়ন কেউই করেনি। করতে চায়ও না। উন্নতি বলতে কেবল যাতায়াত ব্যবস্থার খানিক উন্নয়ন। সুন্দরবনের মাটিতে দাঁড়িয়ে কর্মসংস্থানের বিষয়টিতে সকলেই উদাসীন। অনুর্বর জমিতে শিল্পস্থাপনের কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি, কৃষির ব্যাপারেও সুন্দরবন কেন্দ্রিক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি, শস্য সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা হযনি— হিমঘর তো দূরঅস্ত্। কৃষিতে লাভ কমেছে। শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র কোনো অগ্রগতি ঘটেনি গত কয়েক দশকে। প্রচুর স্কুলে শূন্যপদ, চার-পাঁচ ঘণ্টা জলপথে এসে পড়ানোর ধৈর্য্য থাকে না শিক্ষকদের, কলেজ খুব কম, একটাও বিশ্ববিদ্যালয় নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই ক্ষতি করছে সুন্দরবনের। আর এই কফিনের শেষ পেরেক আয়লা।

দলে দলে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে অন্যত্র, রোজ সকালে কলকাতাগামী বনগাঁ, হাসনাবাদ, ক্যানিং, নামখানা লোকাল দেখলেই বোঝা যায় শহর কলকাতা আসলে টিকে আছে সুন্দরবনের সস্তা শ্রমের ওপর। কৃষিজীবী পরিবারের মহিলারা কলকাতায় চলে আসছে গৃহপরিচারিকার কাজ করতে।

স্বাভাবিকভাবেই উন্নত করা হবে যাতায়াত ব্যবস্থা। ক্যানিং পেরিয়ে রেললাইন চলে যাচ্ছে বাসন্তী, জয়নগর থেকে লাইন হচ্ছে রায়দীঘি কৈখালী অবধি, হাসনাবাদ পেরিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ চলে যাওয়ার প্রস্তাব আসছে। গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর থেকে সুভাষগ্রাম, বিদ্যাধরপুর, চম্পাহাটি কিংবা বারাসাত মধ্যমগ্রাম থেকে বেলঘরিয়া অবধি মেসগুলোয় দেখা যায়

এর পর ৩১ পৃষ্ঠায়

সুন্দরবন: এক অন্য দুনিয়া

পার্থসারথি

ভয়ঙ্কর সুন্দর সুন্দরবন

সুন্দরবন ভয়ঙ্কর, সুন্দরবন সুন্দর। প্রকৃতি এবং জীব-জগতের মধ্যে যে ভারসাম্যের খেলায় মানুষ প্রকৃতিকে হারিয়ে দিতে গিয়ে নিজে হেরে বসে আছে, সারা পৃথিবী জুড়ে যে হেরে যাওয়ার মাশুল গোনা সবে শুরু হয়েছে মাত্র, যার ভয়ঙ্কর পরিণতি ভাবলেও হাড় হিম করে দেয়, প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে সেই চিরন্তন দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মূর্ত রূপ যেন সুন্দরবন। বিগত কয়েকশো বছরে পুঁজিবাদী সভ্যতা যে ভয়ঙ্কর স্ববিরোধী ‘অগ্রগতি’-র পথে এগিয়েছে (যে অগ্রগতির প্রসাদটুকু চেটেপুটে খেতে আমরা শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা কম যাই না) তারই পরিণতি-স্বরূপ ঘটে চলা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে উত্তরের হিমবাহ-বিগলিত জলরাশি সমুদ্র-বক্ষ স্ফীত করে আগামী ৫০/১০০ বছর পরে সুন্দরবনের কতটা অংশ গ্রাস করবে আর কতটা বাসযোগ্য রাখবে, কেউ জানে না। সুন্দরবনের মানুষ অনেকেই এই ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা শুনেছেন, কিন্তু প্রতিকূল প্রকৃতির মোকাবিলা যাদের দৈনন্দিন দিনযাপনের অঙ্গ, বিপর্যয়কে ভয় করলে তাঁদের চলে না। এই তো সেদিন (২০০৯ সালে) ভয়ঙ্কর ঝড় ‘আয়লা’ এসে তছনছ করে দিয়ে গেলো সুন্দরবনের মানুষের জীবন। এখনো বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সেই নোনা-জলের প্লাবনের স্বাক্ষর রয়েছে ন্যাড়া শুষ্ক প্রান্তরে, যেখানে ঘাস অবধি জন্মায়নি আয়লার পর থেকে। তবু সুন্দরবনের মানুষ বেঁচে আছেন, উঠে দাঁড়িয়েছেন ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে, নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন জীবন।

কে বলে সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করেন না, সংগ্রামী নন! এমন এক ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গে যাদের নিত্য ঘর করা, তাঁদের জীবনীশক্তির জোর আমার মতো শহুরে মানুষ বুঝবে কি করে? কলকাতা মহানগরীর এত কাছে, তবু এত অজানা এত বৈচিত্র্য-ভরা একটা অঞ্চল যেন একটা আলাদা জগত। শহরবাসীর কছে যার গুরুত্ব ছোটখাট ছুটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অবগাহন করার একটা নিকটবর্তী স্থান বই তো নয়! কিন্তু কেমন আছে সুন্দরবন, কেমন আছে সুন্দরবনের মানুষ? এও এক গভীর জিজ্ঞাসা, যার উত্তর পাওয়া সহজ নয়। যেখানে প্রকৃতি এবং মনুষ্য-বসতি দুইয়েরই অস্তিত্ব বিপন্ন, সেখানে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবো? সম্প্রতি একটা গবেষণা-প্রকল্পের কাজে সুন্দরবনের কিছু অঞ্চল সমীক্ষা করে, সেখানকার মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা জানা-বোঝার একটা সুযোগ এসেছিল। সন্দেশখালি-১, হিঙ্গলগঞ্জ, সাগর ও নামখানা এই চারটি ব্লক সমীক্ষার জন্য বাছা হয়েছিল। পরে একজন সুন্দরবন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জানলাম, সুন্দরবনের সমস্যা বোঝার জন্য অঞ্চল বাছাই-এর মধ্যেই একটা খামতি থেকে গেছে। সুন্দরবনে জনবসতি গড়ে উঠেছে মূলত তিন ধরনের মানুষের আগমনে। সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এসেছেন মূলত মেদিনীপুরের মানুষ, মধ্যভাগে ২৪ পরগনার মানুষ আর দক্ষিণ-পূর্ব ভাগে মূলত পূর্ব-বঙ্গের মানুষ। ঐতিহাসিকভাবে এই তিন অংশের মানুষের জীবন-চর্যায় অনেক তফাৎ আছে। আমাদের অঞ্চল বাছাই-এ মধ্যভাগ বাদ পড়ে গেছে। আসলে ইতিহাস না জেনে বর্তমান জানতে চাওয়ার এমনই বিড়ম্বনা। তাই আগে ইতিহাসের দিকে এক ঝলক নজর দিয়ে নেওয়া যাক।

সুন্দরবনের তিন ভাগের দু-ভাগ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত, বাকি এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গে। এই বাংলায় সুন্দরবনের যে অংশ সেখানে ১০২টি দ্বীপ। তার অর্ধেকের কিছু বেশি ৫৪টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে জনবসতি গড়ে উঠেছে বিগত ২৫০ বছরে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় সুন্দরবনে মনুষ্য-বসতির প্রাচীন ইতিহাসের স্বাক্ষর মিললেও অষ্টাদশ শতকে পলাশী যুদ্ধোত্তর পর্বে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা যখন বাংলার শাসন ক্ষমতার দখল নিল, সেসময়ে নানাবিধ কারণে সুন্দরবন পুনরায় জনমানবহীন বনাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তাঁবেদারি করার সুবাদে বাংলার মসনদে বসার পর মিরজাফর ১৭৫৯ সালে ২৪ পরগণার এই বিস্তৃত ভূভাগ কোম্পানির হাতে যৌতুক হিসেবে তুলে দিয়েছিলেন। কোম্পানির রাজস্বের সীমাহীন খিদে মেটাতে ১৭৮৩ সালে যশোহর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল (যার নামে সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্বে ‘হেঙ্কেলগঞ্জ’ বর্তমানের হিংগলগঞ্জ-এ পরিণত হয়েছে) সুন্দরবনের সীমা নির্ধারণ ক’রে এই অনাবাদি বনভূমিকে আবাদি করে তোলার পরিকল্পনা করেন। এর পরবর্তী ১০০ বছরে হাসনাবাদ, ভাঙ্গর, হাড়োয়া, কুলপি, হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখা, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর এবং সাগর-এর অধিকাংশ বনাঞ্চল হাসিল করে বসতি পত্তন ও আবাদ শুরু হয়। ১৯৩৯ সালের মধ্যে বন হাসিল ও জমি বন্দোবস্ত করা হয় সন্দেশখালি, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তি, কুলতলি, গোসাবা প্রভৃতি অঞ্চলে। ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই সমগ্র বনভূমিকে বহু সংখ্যক লট-এ ভাগ করে সেগুলো ইংরেজ-অনুগত এক শ্রেণীর জমিদার-বেনিয়া-আমলা-দালালদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেয়। এইভাবে তৈরি হওয়া জমিদার বা লাটদাররা আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মূলত নিম্নবর্ণের ভূমিহীন কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জমির লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসেন জঙ্গল কেটে আবাদ গড়ে তোলার জন্য। এর পরের ইতিহাস হলো এই জমিদার আর কৃষক-প্রজাদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী কয়েকটা স্তরের উদ্ভব, এবং উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি, বেগার চাষ, নিষ্করুণ মহাজনী দাদন-

ব্যবস্থার অবর্ণনীয় অত্যাচারে দ্রুত কৃষক সম্প্রদায়ের ভাগচাষি, খেত মজুর ও মহিন্দারে পরিণত হওয়া। যার পরিণতিতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে বঙ্গদেশের অন্য কিছু অঞ্চলের সাথে সুন্দরবনেও শুরু হয় উত্তাল তেভাগা আন্দোলন। উত্তর-উপনিবেশিক পর্বেও সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে বারবার। ফলস্বরূপ ব্রিটিশ-নিয়োজিত জমিদার সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সুন্দরবন থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নেন, তাঁদের মোসাহেব মধ্যস্বত্বভোগীদের জুলুম-অত্যাচারের অধ্যায়টিরও অবসান ঘটে। কিন্তু তাতে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সমস্যার সমাধান হয়না। পুরনো শাসকদের জায়গায় নতুন শাসকরা আসেন, পুরনো শোষকদের স্থান নেন নতুন আমলের নতুন শোষকেরা। শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম জারি থাকে, কখনো বা সোচ্চারে তার প্রকাশ ঘটে।

উত্তর-উপনিবেশিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক এই অঞ্চলটির অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরা সরকারি ব্যবস্থা ও সংসদীয় দলগুলোর কাছে অবহেলিতই থেকে যান। সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যার বিশেষ পরিবর্তন হয়না। এমনকি যে দলগুলো একটা সময়ে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারাই যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বামফ্রন্ট গঠন করে এই রাজ্যের সরকারি ক্ষমতায় আসীন হয়, সুন্দরবনের কৃষকদের ওপর তখন নতুন করে আক্রমণ নেমে আসে। জঙ্গল হাসিল করে তৈরি করা কৃষিজমি দ্রুত রূপান্তরিত হয় নোনা জলের মেছো-ভেড়িতে। কৃষক নতুন করে জমি থেকে, চাষ-আবাদ থেকে উৎখাত হয়ে সর্বহারায় পরিণত হন, হাজার হাজার পরিবার কৃষিকাজ ছেড়ে পাড়ি দেন ভারতের নানা প্রান্তে এমনকি বিদেশে— কর্ম-সংস্থানের আশায়, নিতান্ত ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য। সেই কাহিনী দিয়েই আমাদের সংক্ষিপ্ত সুন্দরবন পরিক্রমা শুরু করা যেতে পারে।

কৃষক উৎখাতের নতুন পর্ব

সন্দেশখালি-১ নম্বর ব্লকটি কলকাতা মহানগরী থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ওপর সাইন্স সিটি-র কাছ থেকে বাস ধরে কিছুদূর গেলেই আপনি দেখবেন এক বিচিত্র চিত্র। মাঠের পর মাঠ শুধু জল আর জল। কোথাও সবুজের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। গ্রাম বলতে কিছু ঘর-বাড়ির অস্তিত্ব মাঝেমধ্যে দেখা যায়, কিন্তু বাংলার গ্রামের যে বৈশিষ্ট্য— 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সব মেছো ভেড়ি হয়ে গেছে। নোনা জল কৃষিজমিতে ঢুকিয়ে মাইলের পর মাইল জমি ভেড়ি তথা মাছ-চাষের এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে, বা রূপান্তরিত করা হয়েছে। কে বা কারা একাজ করলো, গ্রামের অধিবাসীরা যাকে তাঁদের সর্বনাশ বলে চিহ্নিত করেছেন, কী করে সম্ভব হোল সেই রূপান্তর কৃষক-প্রেমী বামফ্রন্টের আমলে? সমীক্ষার শুরুতেই আমরা সরবেরিয়া অঞ্চলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে দেখা করেছিলাম। তিনি সিপিআই(এম) দলের স্থানীয় নেতাও বটে। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে উক্ত গ্রাম পঞ্চাতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন, সেই ছবি তাঁর অফিসের দেওয়ালে সুসজ্জিত করে রেখেছেন।

বামফ্রন্ট-বিরোধী প্রবল হাওয়ার মধ্যেও তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং প্রধান হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করে আপনার এলাকায় এমনভাবে মাছের ভেড়ি সব কৃষি-জমি গ্রাস করে নিল? তিনি জানালেন, আমরা বামপন্থীরা ভেড়ির বিরোধী, কৃষি-জমির এমন রূপান্তর আমাদের মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু তাহলে কী করে এমনটা সম্ভব হোল, গোটা এলাকা ভেড়িতে ছেয়ে গেল? তিনি বললেন, কৃষিজমির ভেড়িতে রূপান্তর ১৯৭৫ সালে শুরু হয়েছিল, তারপর আমরা আর আটকাতে পারিনি। কৃষকরা ভেড়ি-মালিকদের জমি লিজ দিয়ে নিশ্চিন্ত রোজগার করতে চেয়েছে। এর ক্ষতিকারক দিক তখন তাঁরা বোঝেনি, আমরাও বোঝাতে পারিনি। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা বলতে পারেন। এখন কৃষকরা ভেড়ির থেকে ক্ষতি বুঝতে পারছে, কিন্তু কিছু করার নেই। ভেড়িগুলো আবার কৃষিজমিতে রূপান্তর করতে গেলে ৩/৪ বছর ফেলে রাখতে হবে যাতে বর্ষার জলে মাটির নোনা ধুয়ে যায়, কিন্তু এতদিন জমি ফেলে রাখা কৃষকদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে ভেড়ি থেকেই যাচ্ছে। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সরকার বদলের পর তো অনেক জায়গায় শুনছি সিপিএম-পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ডকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছেনা, এখানে সেরকম কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি? উনি জানালেন, এখানে সকল দলের সহযোগিতা নিয়েই আমি কাজ করি, কোনো অসুবিধা নেই।

ওই এলাকারই গ্রামের মানুষজন কিন্তু অন্য কথা বললেন। তাঁরা জানালেন, পঞ্চায়েতের প্রত্যক্ষ মদতেই এখানে ভেড়ির প্রসার হয়েছে। শুরুতে গ্রামের ধনীরা, যাদের হাতে একটু বেশি জমি আছে, তাঁরা ভেড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে বাইরে থেকে, মূলত কলকাতা থেকে অর্থবান লোকরা ভেড়িতে অর্থ-লগ্নি করতে এগিয়ে আসেন, তাঁদের অনেকেই নিজেরাই কৃষি-জমি লিজ নিয়ে ভেড়ি শুরু করেন। ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের প্রলোভিত করা হয় বার্ষিক কিছু অর্থের বিনিময়ে তাঁদের জমি ভেড়ির জন্য লিজ দিতে। যে সমস্ত কৃষকরা এই ব্যবসায় মদত করতে রাজি ছিলেন না, তাঁদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। গ্রামবাসীর অভিযোগ, এই প্রধানের দলবলই কৃষকদের ওপর জোর-জুলুম করে ভেড়ির জন্য জমি দখলে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। যারা জমি দিতে রাজি নয়, তাঁদের জমিতে নালা কেটে নোনাজল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধান সাহেবের সেই দলবল এখন তৃণমূল হয়ে গেছে, তাই তিনি এখন সিপিএম তৃণমূল দু'পক্ষের মদতই

পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই এলাকার সবচেয়ে বড়ো ভেড়ির মালিক হলো স্বয়ং প্রধানের ভাইপো, প্রায় ৫০০ বিঘার ওপর কৃষি-জমি নিয়ে যার বিশাল ভেড়ি-সাম্রাজ্য।

এক একজন ভেড়ির মালিক বহু চাষির জমি লিজে নিয়ে বর্তমানে শত শত বিঘা জমির ওপরে ভেড়ি-ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাঁরা এক নতুন ধরনের ধনিক শ্রেণী, যাঁরা একই সাথে পুঁজি এবং ভূ-সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে মুনাফার পাহাড় তৈরি করছেন, তাঁরাই এখানকার অর্থনীতি-রাজনীতি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকী খালের মাধ্যমে ভেড়িতে নোনা জল ঢোকানোর জন্য খালের মুখে সরকারি অর্থে প্রতিষ্ঠিত স্লুইস গেটটি পর্যন্ত তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। খাতায়-কলমে অবশ্য এই অঞ্চলের বেশিরভাগ জমির মালিক পশ্চিমবঙ্গের অন্য এলাকার মতোই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। কিন্তু তাঁদের নিজেদের জমির ওপরে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ নেই। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ভেড়ির মালিকদের কাছে জমি-সমর্পণ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভেড়ির আশেপাশের কৃষি জমিতে ভেড়ির নোনা জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে প্রবেশ ক'রে ঐসব জমির চরিত্রও ধীরে ধীরে বদলে দেয়। জমির নোনা যতো বাড়তে থাকে, সেখানে কৃষি উৎপাদন তত কমতে থাকে। এইভাবে এক সময় চাষি বাধ্য হন তাঁর জমিটি হয় পাশের ভেড়ির মালিকের কাছে লিজ-প্রথায় ছেড়ে দিতে, অথবা নিজেই ভেড়ি শুরু করতে।

এইভাবে বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ জমি ভেড়িতে পরিণত হয়েছে। যে ২০ শতাংশ জমিতে কৃষিকাজ হয়, সেই জমিতেও ভেড়ির জন্য কৃষি উৎপাদন মার খাচ্ছে। এটা বোধহয় সকলেই জানেন, এইসব ভেড়িতে মাছ চাষ বলতে মূলত রপ্তানি-যোগ্য বাগদা চিংড়ির চাষ হয়, যা বিদেশি মুদ্রা এনে রপ্তানি-বাণিজ্যে যুক্ত মুষ্টিমেয় ধনীর তহবিল বৃদ্ধি করে। ফলে এই চাষের পেছনে বড়ো বড়ো অর্থবান আর ক্ষমতাবান মানুষ জুটে যাবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? গ্রামবাসী জানালেন, ১৯৮৭ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং এখানে এসে এক জনসভায় বলেছিলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে অনেক বিদেশি মুদ্রার প্রয়োজন, বাগদা চিংড়ির চাষ তাই আমাদের রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। এরপর নামখানা ব্লকে কাজ করতে গিয়ে শুনলাম, সেখানে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের হেনরি দ্বীপে জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দন বসুর ভেড়ি আছে। ক্ষমতা আর পুঁজি মিলেমিশে যে আগ্রাসী চেহারা নেয়, বামফ্রন্ট রাজত্বে এমন স্বাক্ষর খুব কম ছিল না।

ভেড়ির ফলে কৃষকদের কী ক্ষতি? সত্যিই তো, জমিতে ধান চাষ না করে মাছ চাষ করলে যদি লাভ বেশি হয়, তা নিয়ে আপত্তি তোলা কেন? বিগত জমানায় কৃষিজমি থেকে কৃষক উচ্ছেদ করে সেখানে আধুনিক শিল্প-স্থাপন নিয়ে একই যুক্তির সম্মুখীন আমরা হয়েছি। এখানেও স্থানীয় গ্রামবাসী যারা ওই জমির ওপর জীবন-জীবিকার জন্য নির্ভরশীল ছিলেন, বা এখনো কমবেশি আছেন, তাঁরা কী বলছেন, সেদিকেই আমরা মনোযোগ দেবো।

প্রথমত, গ্রামের প্রান্তিক মানুষকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশিরভাগ কৃষিজমি ভেড়ির জন্য হস্তান্তর করতে একপ্রকার বাধ্য করা হয়েছে। গ্রামে সেই ব্রিটিশ আমলের লাটদার ব্যবস্থা যেন নতুন রূপে ফিরে এসেছে। অথবা সেই অতীতের কুখ্যাত নীলকরের মতোই যেন এই 'জলকর' ব্যবস্থার (মাছের ভেড়ির আরেক স্থানীয় নাম 'জলকর') সূত্রপাত হয়েছে, যেখানে চাষিকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে মাছ চাষের জন্য জমি দিতে অথবা মাছ চাষে নামতে বাধ্য করা হয়েছে। এই নতুন ব্যবস্থায় গ্রামের ও বাইরের কিছু ধনী প্রচুর মুনাফা কামানোর সুযোগ পেলেন ঠিকই, কিন্তু গ্রামের গরিব মানুষ আরো গরিব ও নিঃস্ব হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়ত, এই জলকর মালিকরা প্রথম থেকেই কৃষি-জমির দখল নেওয়া থেকে শুরু করে ভেড়ি পরিচালনার জন্য প্রচুর কাঁচা টাকা ছড়িয়ে অচিরেই তাদের পোষা দালাল এবং গুন্ডা বাহিনীর জন্ম দিল, যারা গ্রামীণ সমাজে গরিব মেহনতি মানুষের যে ঐক্য বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে দমন-পীড়নের এক নয়া রাজ শুরু করলো। বহু ক্ষেত্রে অবশ্য শাসক পার্টির বাহিনীই ভেড়ি মালিকদের বাহিনীতে পরিণত হলো। রাজ্যে শাসক বদল হওয়ায় এই বাহিনীর হাতের ঝান্ডা বদলেছে মাত্র, বাহিনীর চরিত্র বদলায়নি। এদের মারফত বড়ো ভেড়ির মালিকরা গ্রাম সমাজের ওপরে তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। পরিবর্তনের জমানাতেও দেখলাম, গ্রামের সাধারণ মানুষ ভেড়ি সম্পর্কে, ভেড়ি মালিকদের সম্পর্কে, এদের সাথে রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগ সম্পর্কে মন খুলে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। আগেই বলেছি, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রাম-প্রধান সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল দুই দলেরই পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন। রাজ্যের প্রধান দুই যুযুধান দল এখানে কোন জাদুমন্ত্রে মিলেমিশে কাজ করছে, তা বুঝতে রাজনীতির বিশেষজ্ঞের খোঁজ করতে হয়না। অবশ্য ভেড়ি-দখল নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ নতুন কিছু নয়, পেশী-শক্তির ওপর নির্ভরশীল ভেড়ির মালিকানা বা দখলদারি নিয়ে সুন্দরবনের বহু অঞ্চল অশান্ত হয়েছে বারবার।

তৃতীয়ত, কৃষি জমির ভেড়িতে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় কৃষকরা নতুন করে জমি হারালেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, চাষ-আবাদই ছিল যাদের মূল জীবিকা, তাঁরা এক প্রকার ভূমিহীন হলেন। তাঁদের যে সামান্য জমিটি ভেড়িতে পরিণত হলো, তার বিনিময়ে কিছু বার্ষিক উপার্জনের ব্যবস্থা হোল ঠিকই, কিন্তু যা ঘরে এলো খোয়াতে হলো তার থেকে আরো বেশি। ভেড়ির নোনা জলের প্রকোপে গোটা গ্রাম থেকে সবুজ মুছে গেল। এমনকী বাস্তুজমিতেও আর কিছু ফলে না। অত্যন্ত গরিব মানুষও তাঁর কুটির-সংলগ্ন সামান্য জমিতে এটা-ওটা ফলিয়ে বা গরু-ছাগল চরিয়ে জীবিকার সংস্থান করতেন, সব বন্ধ হয়ে গেল। নোনার আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম থেকে সবুজ নিশ্চিহ্ন হলো। জমি তো গেলই, অন্য সব রকম জীবিকার পথও বন্ধ হয়ে গেল। গ্রামগুলিতে এখন বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু

জন্মায় না, যে গাছে কাঁটা ছাড়া আর কিছু মেলে না। অন্যদিকে, ভেড়ির জন্য যারা জমি লিজ দিয়েছেন তাঁদের সেই লিজ-চুক্তির টাকা আদায় করতে কালঘাম ছোটে, ভেড়ির মালিক বা ম্যানেজারদের দুয়ারে ধরনা দিতে হয়। টাকা মেলে ছোট ছোট কিস্তিতে যা তাঁদের তেমন কাজে লাগেনা। ছোট ছোট জোতে নানান শস্য চাষ করে যারা সংবৎসরের খাদ্য সংস্থান করতেন, তাঁরা এবার নিরন্ন হয়ে গেলেন।

চতুর্থত, কৃষিকাজে যে পরিমাণ লোক লাগত ভেড়ির কাজে লাগে তার থেকে অনেক কম লোক। ফলে, যারা খেতমজুরি করে আগে বছরের বড়ো সময়টা কাটাতেন, তাঁদের বেশিরভাগই বেকার হয়ে গেলেন। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরাও ভেড়িতে জমি দিয়ে এখন মজুর খাটেন, এদিক-ওদিক মজুরির কাজ খোঁজেন, গ্রামে তা না মেলায় দূর দেশে পাড়ি দেন। হু হু করে বাড়ে অভিবাসন। কলকাতা, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর থেকে সুদূর আরব পর্যন্ত পাড়ি দিচ্ছেন প্রত্যন্ত এইসব গ্রামের মানুষজন। বহির্দেশে অজানা অচেনা পরিবেশে জীবিকার্জনের এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। সরবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ, যারা আগে কৃষিকাজে যুক্ত ছিলেন, এখন পাড়ি দেয়েছেন দেশান্তরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবার রয়ে গেছে গ্রামে, শক্ত-সমর্থ পুরুষরা গেছেন বাইরের কাজে। সেখানেও তাঁরা মজুরই খাটছেন, প্রধানত নির্মাণ কাজে যুক্ত হয়ে। সেখানে মজুরির হার পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি হলেও নিজেদের থাকা-খাওয়ার খরচ মিটিয়ে সামান্য টাকাই তাঁরা ঘরে পাঠাতে পারেন। ফলে ঘরের অভাব মেটে না, খুব অল্প সংখ্যক পরিবারই বাইরে অর্জিত টাকায় সাশ্রয় করতে পারেন, সেই টাকা দিয়ে ঘর মেরামতি করেন, আসবাব কেনেন বা জমি কিনে বোরো চাষ শুরু করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৯ সালে বিধ্বংসী তুফান আয়লার পর গোটা সুন্দরবন থেকেই এরকম বাইরে কর্ম-সংস্থানের খোঁজে যাওয়ার হার বেড়ে গেছে। কারণ আয়লা নোনা জলের প্লাবন ঘটিয়ে কৃষিকাজের অপরিমেয় ক্ষতি করে দিয়ে গেছে।

পঞ্চমত, ভেড়ির ব্যবসা পুঁজি-নিবিড় হওয়ায় যেসকল বহু ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষক তাঁদের ছোট ছোট জোতে বাগদা চাষ শুরু করেছেন, তাঁরা লাভের মুখ বিশেষ দেখতে পারছেন না। এর প্রধান কারণ হিসেবে গ্রামবাসী জানালেন, গ্রামে নোনা জল নিয়ে আসার জন্য যে সরু নালাটি আছে, সেটিকে বড়ো জলকর মালিকরাই নিয়ন্ত্রণ করে। ভেড়ির জন্য প্রয়োজনীয় নোনা জল একমাত্র সেই পথেই নিয়ে আসা যায়। বিদ্যাধরী আর মাতলা নদীর মধ্যে সংযোগকারী একটা বড়ো খাল অতীতে এই গ্রাম থেকে অন্যান্য এলাকায় যাতায়াতের জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত, সেই খালটি মজে গিয়ে তার ওপরে ঘর-বাড়ি, খেত বা ভেড়ি হয়ে গেছে। গোটা সুন্দরবন জুড়ে প্রাকৃতিক খালগুলো সুদীর্ঘকাল সংস্কার না হওয়ার ফলে মজে গেছে, সরকারি অবহেলার এমন চিত্রটি সর্বত্র দেখা যায়। গ্রামের প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ বৃহৎ খালটি মজে যাওয়ায় নদীর সাথে সংযোগ ওই ক্ষুদ্র নালাটি মারফত, স্লুইস গেট নিয়ন্ত্রণ করে যার জল প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন বড়ো ভেড়ির মালিকরাই।

ষষ্ঠত, ভেড়ির মালিকদের হাতে খালের স্লুইস গেট নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকায় ওই অঞ্চলের বেশ খানিকটা প্রতি বর্ষার সময় জল নিষ্কাশন না হওয়ার দরুন ডুবে যায়। সুন্দরবনে নদীর সাথে যুক্ত খালগুলো তিন রকমভাবে কাজে লাগে বা লাগানো হয়। এক, বর্ষার সময় খেত-খামারে জমে থাকা জল নিষ্কাশনের জন্য। দুই, জোয়ারের সময় নদী থেকে নোনা জল মাছের ভেড়িতে ঢোকানোর জন্য। তিন, বর্ষার মিষ্টি জল ধরে রেখে সেচের কাজে বা অন্যান্য গেরস্থালির কাজে লাগানোর জন্য। প্রথম আর তৃতীয় পদ্ধতি কৃষি-কাজ এবং সাধারণভাবে গ্রামীণ জীবনের পক্ষে উপযোগী, যেহেতু সুন্দরবনের গ্রামে জন-বসতি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে মিষ্টি জলের অভাব। সমুদ্র-উপকুলবর্তী অঞ্চল হওয়ার ফলে এখানকার প্রতিটি নদী নোনা-জলে ভরা। সেই জলই খাল দিয়ে ঢোকে এবং নদীর জলে প্লাবন হলে নোনা জল পুকুর-খাল-বিল এমনকী মাটি পর্যন্ত নোনা করে দিয়ে যায়, ঠিক যেমনটি হয়েছিল আয়লার সময়।

তাই সুন্দরবনের বেশিরভাগ খাল যেখানে নদীর সাথে মিশেছ সেই সংযোগ স্থলে সেচ দফতর থেকে স্লুইস গেট বসানো হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য বর্ষার মিষ্টি জল ধরে রেখে সেচের কাজে লাগানো, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। পাশাপাশি, অতি-বর্ষণের সময় কৃষি-জমিতে জমে যাওয়া অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন করা, যাতে বৃষ্টির জলে বন্যা না হয়। কিন্তু ভেড়ি মালিকদের হাতে স্লুইস গেটের নিয়ন্ত্রণ চলে গেলে দুটো উদ্দেশ্যই বাতিল হয়ে যায়, যা এখানে হচ্ছে। সরকারি অর্থে কৃষির উন্নতির জন্য বসানো স্লুইস গেট কাজে লাগছে অল্প কিছু ধনী ব্যক্তির অতি-মুনাফা কামানোর স্বার্থে। এবং এটা হচ্ছে কলকাতার অনতিদূরে পঞ্চায়েত এবং ডান-বাম সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায়। কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো সংগঠিত শক্তির খোঁজ এই অঞ্চলের কৃষকেরা পাননি।

সন্দেশখালি ব্লক ছাড়াও নামখানা ব্লকের তেভাগা আন্দোলনের জন্য খ্যাত উত্তর ও দক্ষিণ চন্দনপিড়ি গ্রাম-দুটিতেও ভেড়ির সাথে চাষ-আবাদের দ্বন্দ্ব লক্ষ করেছি, যদিও এই অঞ্চলে ভেড়ির প্রাদুর্ভাব বেশি নয়, বা কৃষিজমি গ্রাস করে ভেড়ি হয়েছে এমনটাও নয়। এখানে নদী-বাঁধের ধার ধরে (বাঁধের ভেতরের এবং বাইরের দিকে) কিছু লোক ভেড়ি তৈরি করেছেন। যারা বাঁধের ভেতরের দিকে ভেড়ি করেছেন, তাঁরা সাধারণত বাঁধের নিম্নাংশ খুঁড়ে সেখানে পাইপ বসিয়ে জোয়ারের সময় নদীর জল ভেড়িতে ঢোকান। কৃষকদের আপত্তি হচ্ছে, এইভাবে নোনা-জল আনার জন্য খোঁড়া-খুঁড়ির ফলে

বাঁধ ঐসব স্থানে দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং একটু দুর্যোগে সেখানেই প্রথম বাঁধে ভাঙন দেখা দেয়।

নদী-বাঁধ আর ভাঙনের সমস্যা

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবনের উপকূল অঞ্চল চারদিকে নদী আর সমুদ্র দিয়ে ঘেরা অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি। সন্দেশখালি ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্বে হিঙ্গলগঞ্জ থেকে শুরু করে পশ্চিমে নামখানা বা সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলবর্তী সুন্দরবনের সমস্যার চরিত্র আরো গভীর এবং বহুবিধ। সুন্দরবনের সমস্যা যেটুকু বুঝেছি, একটা প্রবন্ধের পরিসরে তার প্রকাশ ঘটানো মুশকিল। যেমন নদী-বাঁধের সমস্যা। গোটা সুন্দরবনের জনবসতি গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত নদী-বাঁধের ওপর নির্ভর করে। কারণ সুন্দরবনের নদীগুলোতে ভরা কোটালের সময় সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে দ্বীপগুলোতে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়। সেই ব্রিটিশ আমলে জমিদার বা লাটদারদের উদ্যোগে নতুন করে জনপদ স্থাপনের সময়েই নদীগুলোতে বাঁধ দেওয়া হয়, যাতে দ্বীপগুলো নিয়মিত প্লাবিত হয়ে জনপদ ও কৃষি-ব্যবস্থাকে বিপন্ন না করে তোলে। উপনিবেশিক শাসকদের রাজস্ব সংগ্রহের কাজে যাতে বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু এইভাবে নদীকে বাঁধার ফল কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, জনপদের ভবিষ্যতকে কীভাবে বিপন্ন করতে পারে, তা নিয়ে মাথাব্যথা বিদেশি শাসকদের ছিল না। আজো নদী-বাঁধের সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে সরকারি উদ্যোগ নিতন্তই অপ্রতুল।

প্রথমে দেখা যাক, বাঁধ কীভাবে জনপদকে বিপন্ন করছে। এই যে ৩৫০০ কিমি বাঁধের কথা আমরা বললাম, তা মূলত মাটি দিয়ে নির্মিত, কোথাও কোথাও মাটির বাঁধের ওপর ইট, পাথর বা সিমেন্টের বস্তা চাপিয়ে বাঁধের শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সুন্দরবনের বড়ো নদীগুলোকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা এইভাবে নির্মিত বাঁধের নেই। বিশেষ করে কালিন্দী, মাতলা, রায়মঙ্গল, মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী প্রভৃতি নদীগুলির চোরা-স্রোত বাঁধের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে বাঁধকে ক্রমাগত দুর্বল করে ফেলে। ফলে একটু বেশি মাত্রায় ঝড়-বৃষ্টি, বা জোয়ারের জলের চাপে প্রতি বছর কোথাও না কোথাও বাঁধ ভাঙে। যেখানেই গেছি, প্রায় সর্বত্র দেখা গেছে মানুষের প্রধান ক্ষোভ বাঁধ নিয়ে, বাঁধের ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া নিয়ে, প্রায় প্রতি বছর বাঁধ ভেঙে নোনা জলের প্লাবন নিয়ে। বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্ব সেচ দফতরের, আর জরুরি মেরামতের কাজ পঞ্চায়েত একটা মাত্রায় করে থাকে। আর যখন ঝড়ে বাঁধ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, তখন গ্রামবাসী নিজেরা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে বাঁধ রক্ষার সংগ্রাম করেন। এরকম একাধিক গ্রামের গল্প শুনেছি, যেখানে গত আয়লার সময় গ্রামবাসী নিজেরাই বাঁধ মেরামত করে প্লাবন আটকেছেন।

কিন্তু আয়লার সময় জল-স্ফীতির মাত্রা এমনই ছিল যে, বেশিরভাগ জায়গায় বাঁধ ছাপিয়ে নদীর জল গ্রামকে গ্রাম প্লাবিত করেছে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর কিছু করার ছিল না। গ্রামবাসী অনেকেই বলেছেন, আমরা প্রতিদিন ৫-৬ ফুট জলের তলায় ঘুমাই। অর্থাৎ জোয়ারের সময় সুন্দরবনের মানুষ যখন নিদ্রা যান, তখন নদীর জল তাঁদের বাসভুমির থেকে ৫-৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থান করে। সুন্দরবনের দ্বীপগুলোর অবস্থা অনেকটা কানা-উঁচু থালা বা বাটির মতো, বাঁধ না থাকলে জোয়ারের জল দ্বীপগুলির অনেক জমি প্লাবিত করবে। আর ভরা কোটালের সময় বা ঘূর্ণি-ঝড়ে সমুদ্র বা নদী স্ফীত হলে গোটা সুন্দরবনকে প্লাবিত করবে, যেমনটা আয়লার সময় হয়েছিল।

আয়লার অব্যবহিত পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সুন্দরবনের নদী-বাঁধের সমস্যা মোকাবিলার পদ্ধতি নিরূপণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার সুন্দরবনে পাকা কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের জন্য ৫০৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ঠিক হয়, ৪৫০ কিমি এলাকায় বর্তমান বাঁধের অবস্থান থেকে পিছনের দিকে সরিয়ে নতুন বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। এজন্য প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, যেসব জমির অধিকাংশই বাস্তু বা কৃষি জমি হিসেবে গ্রামের মানুষ ব্যবহার করে আসছেন। জমি অধিগ্রহণের জন্য ১৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করাও হয়েছে, কিন্তু কাজ প্রায় কিছুই এগোয় নি। নতুন সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনেকেই জমির ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি পরিবার-পিছু একজনের চাকরির দাবি তুলছেন। জানা গেল, যেসব স্থানে জমি নেওয়া শুরু হয়েছিল সেখানে চাকরি তো দূরের কথা, ক্ষতিপূরণের টাকাটাও সরকার ঠিকমতো দিতে পারে নি। ফলে গ্রামবাসী বাঁধের জন্য জমি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। সুন্দরবনে জনবসতি এতটাই ঘন যে একটা আনুমানিক হিসেব হলো, প্রতি এক কিলোমিটার জমি অধিগ্রহণ করতে ৫০০ জনের কর্ম-সংস্থান করতে হবে। সুন্দরবনের মানুষ ধরে নিয়েছেন, এত কাজের ব্যবস্থা সরকার কোনদিনই করতে পারবে না, ফলে বাঁধের কাজও এগোবে না। আরো অনেক সরকারি প্রকল্পের মতো এই প্রকল্পটিও খাতায় কলমেই থেকে যাবে।

আসলে সুন্দরবনের নদী-বাঁধ নিয়ে সমস্যা আরো গভীরে। নদীগুলো তাদের সমুদ্র-মুখী গতিপথে পলি বহন করে এনে সমুদ্রের মুখে জমা করে করে এই বিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এই পলি বয়ে আনা তো শেষ হয় নি, কিন্তু নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণের ফলে পলি জমা করার স্থান সংকুচিত হয়েছে। নদীর পলি এখন নদী-গর্ভেই জমা হচ্ছে, যা নদীর নাব্যতা কমিয়ে ফেলছে, কমে আসছে নদীর জল ধারণক্ষমতা। ফলে জোয়ারে-তুফানে নদী আরো স্ফীত হয়ে উঠছে এবং বাঁধের ওপরে চাপ বাড়িয়ে তুলছে। বহু স্থানে নদী শুধু বাঁধই ভাঙেনি, তীরবর্তী গ্রামের অনেক জমি পর্যন্ত নদী-গর্ভে বিলীন হয়েছে। কিছু প্রবীণ সুন্দরবনবাসী বলেছেন, আমাদের এখানে বসবাস করাই উচিত

হয়নি। জনবসতির চাপে জঙ্গল ক্রমাগত পিছু হঠছে, সুন্দরবনের বিখ্যাত বাদাবন (ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট) যা সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝাকে প্রতিহত করার প্রথম কাজটা করে থাকে, যাকে বলা যায় ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, বহু স্থানে তা নিশ্চিহ্ন করে মানুষ নিজেই নিজেদের বিপন্ন করেছে। বাগদা চাষের ভেড়িগুলোর মীন-এর চাহিদা মেটাতে বাঁধ অতিক্রম করে দরিদ্র পরিবারের মহিলা-পুরুষ নদীর পার ধরে মশারির জাল দিয়ে মীন ধরে চলেছে, যা বাঁধের ক্ষতি করার পাশাপাশি নদীতে অন্যান্য বহু প্রজাতির মাছের চারা নষ্ট করছে। সুন্দরবনের নদীগুলোতে মাছের যোগান ক্রমাগত কমে আসছে। বাগদা-চাষের ভেড়িগুলো এভাবেও সুন্দরবনের মানুষের ক্ষতি করছে।

সুন্দরবনে জীবন-জীবিকার সংগ্রাম

সুন্দরবনে সবচেয়ে অসুন্দর হলো এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অসীম দারিদ্র্য, যার মূলে রয়েছে কর্ম-সংস্থানের চূড়ান্ত অভাব। সেজন্যই মানুষ নদীতে নেমে বাগদার মীন ধরেন, জীবন হাতে নিয়ে মধু বা জ্বালানি সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে ঢোকেন। কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে শামসেরগঞ্জে বিধবা পাড়া তৈরি হয়েছে, জঙ্গল-সংলগ্ন যে বসতির প্রায় প্রতিটি পরিবার বাঘের হাতে তাদের সক্ষম পুরুষটিকে হারিয়েছে। শামসেরগঞ্জে একটা ছোট্ট নালার ওপারেই জঙ্গল শুরু, যে নালাতে ভাটার সময় জল থাকে না বললেই চলে। বাঘের উৎপাত ঠেকাতে জঙ্গলের সীমানা জাল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, যে জাল কেটে হামেশা গ্রামগুলোতে শিকার-সন্ধানী বাঘ মহারাজের পদার্পণ ঘটে। দেখলাম, দিনের আলোয়ই সেই সীমানা পেরিয়ে অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ জঙ্গলে ঢুকছেন সামান্য কাঠ-কুটো সংগ্রহের জন্য, একপ্রকার জীবন হাতে করেই।

সুন্দরবন মূলত এক ফসলি এলাকা, বর্ষার ধান ছাড়া অন্য কিছু চাষ হয় না বললেই চলে। কারণ এখানে সেচের ব্যবস্থা নেই। নদীর জল নোনা, আর মাটির তলায় মিষ্টি জলের সন্ধান ৯০০-১০০০ ফুট নিচে পাওয়া যায়, যা পানীয় জলের সমস্যা মেটাতেও যথেষ্ট নয়। এখন এই বর্ষার ধানের ফলনও অনেকটা কমে গেছে আয়লার ঝড়ে ধানখেতে নোনা জল প্রবেশের ফলে। ফলে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক যারা শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তাঁদের জীবিকার সংস্থান গ্রামে থেকে করা যাচ্ছে না। এজন্য কর্মক্ষম লোকজন, বিশেষত যুবকরা, ব্যাপকভাবে বাইরের রাজ্যে এমনকী বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন, যেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। যেটা নতুন কথা তা হলো, সুন্দরবনের যেসব অঞ্চলে বা গ্রামে সেচের জলের ব্যবস্থা করা গেছে সেখানে কিন্তু নানারকম চাষ করে কৃষক-সমাজ আয়লার বিপর্যয় অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১৯৭৯-৮০ সাল নাগাদ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় ৪০০ কিলোমিটার সেচ-খাল খনন করা হয়। এইসব খালে স্লুইসগেট লাগিয়ে বর্ষার জল ধরে রেখে সেচের কাজ লাগানো হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়, কিন্তু বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা না থাকায় বেশিরভাগটাই মিশে যায় নোনা জলের নদীতে। যেখানেই খাল বা পুকুর সংস্কার করে বর্ষার জল ধরে রাখা গেছে, সেই জল চাষের কাজে লেগেছে, কিছু অঞ্চলে কিছু পরিমাণে বোরো ধান ও সব্জি চাষও হচ্ছে। সাগর দ্বীপে তো পুকুরের জলে মিঠা পাতার পান চাষ সবচেয়ে লাভজনক, যে পান ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকী বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

কৃষির পরই মাছ-ধরা সুন্দরবন মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকা। বাগদা চাষের ভেড়ি ছাড়াও সুন্দরবন-সংলগ্ন সমুদ্র এবং নদী-নালা, খাল-বিলে নানারকমের প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, যা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ যেমন ধরেন, তেমনি ট্রলার করে গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরে বিক্রি করে এক নব্য ধনিক শ্রেণীও জন্মলাভ করেছে। আবার প্রায় প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব ছোট পুকুর আছে, সেগুলো সংস্কার করে অনেকে মিষ্টি জলের মাছ চাষ করেন। কিন্তু সুন্দরবনের ৯০ শতাংশ মানুষই কম-বেশি কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল।

শূন্য নীতির দেশ

সমস্যা হচ্ছে, সুন্দরবনের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিপুল মানব-সম্পদ, পরস্পর-সম্পৃক্ত এই দুই সম্পদের স্থায়ী সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে না রাজ্য সরকার না কেন্দ্রীয় সরকার আজ অবধি কোনো নীতি তৈরি করতে পেরেছে। অথচ ১৯৮৪ সালে সুন্দরবনকে ভারত সরকার জাতীয় অভয়ারণ্য বা ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৮৯ সালে ইউনেস্কো এবং আরো কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা সুন্দরবনের ৯৬৩০ কিলোমিটার অঞ্চলকে সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বা সুন্দরবন জীব-পরিমন্ডল এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে। এইসব ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সাধারণভাবে সুন্দরবনের জীব-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এতটাই গুরুত্বলাভ করে যে এই দ্বীপাঞ্চলে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষের বেঁচে থাকার নিদারুণ সমস্যাগুলো অনেকটাই যেন তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ এই বিপুল জনবসতির মধ্যে তফশিলি জাতি ও উপজাতির অংশ প্রায় ৪৫ শতাংশ, যাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণে ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

উল্লেখ করার বিষয় হোল, সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ বা সুন্দরবন ডেভলপমেন্ট বোর্ড নামে একটি দফতর চালু করে এবং ১৯৯৪ সালে একজন মন্ত্রীর অধীনে সুন্দরবন বিষয়ক দফতর খোলা হয়। কিন্তু এতাবৎ সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোনো নির্দিষ্ট নীতি বা প্রকল্প রাজ্য সরকার গ্রহণ করতে পারেনি। এই দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী বা বর্তমান মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরার সাথে আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় সুন্দরবন নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ সরকারের কোনো নীতি ছিল কিনা, বা আছে

কিনা সে প্রসঙ্গটি সযত্নে এড়িয়ে যান। তাঁরা রাস্তা-ঘাট-বাজার-ব্রিজ— এই সব উন্নয়মের ফিরিস্তি দেন। সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় একাধিকবার কান্তি গাঙ্গুলী বলেন, সুন্দরবনের মানুষের অবস্থার নাকি এতটাই উন্নতি হয়েছে যে, তাঁদের অনেকের অনুষ্ঠানবাড়িতে এখন বিলিতি মদ পরিবেশন করা হয়। আবার তিনি এটাও বলেন যে, দক্ষিণ কলকাতার ৯৯ শতাংশ গৃহ-পরিচারিকা সুন্দরবন থেকে রোজ কলকাতায় আসেন। তিনি স্বীকার করেন যে, আইএফএডি-র প্রকল্পটিই এপর্যন্ত সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য নেওয়া একমাত্র বড়ো প্রকল্প। নদীর নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ি তৈরি, নদীর চরে বেআইনি ইট-ভাঁটার রমরমা ব্যবসা, এমনকী প্রচুর অল্প-বয়েসী মেয়েদের সুন্দরবন থেকে পাচার হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও তিনি স্বীকার করলেন। শুধু এহেন সমস্যা-কণ্টকিত সুন্দরবনের মধ্যে কারা অনুষ্ঠান-বাড়িতে মদের ফোয়ারা ছোটান, সেটা বোঝা গেল না।

আর নতুন সরকারের আমলে তো দু-বছরের মধ্যে দুজন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী হলেন। প্রথম জনের বিরুদ্ধে বর্তমান মন্ত্রী মহোদয় প্রকাশ্যেই বন-সৃজনের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনেছেন। সুন্দরবনের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ও বর্তমান মন্ত্রী ও সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলে এটা স্পষ্ট হলো যে সুন্দরবনের জন্য বর্তমান বা অতীত কোনো সরকারেরই সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেই। বিদেশি এজেন্সি বা কেন্দ্র থেকে অর্থ বরাদ্দ হলে এই দফতর জেগে ওঠে, সেই অর্থও অধিকাংশে মাঝপথে আত্মসাৎ হয়ে যায়। সুন্দরবনের গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, আয়লার জন্য বরাদ্দ ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে রাজনৈতিক দলবাজি হয়েছে। যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তেমন পরিবার বঞ্চিত হয়েছেন বা আংশিক ক্ষতিপূরণ ২৫০০ টাকা পেয়েছেন, সেখানে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ লোকজন তেমন ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও পূর্ণ ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ ১০০০০ টাকা পেয়েছেন।

সুতরাং এই রাজ্য বা গোটা দেশজুড়ে উন্নয়নের নামে যে ঠগবাজি, রাহাজানি, স্বজনপোষণ আর পুঁজির তোষণ চলছে, সুন্দরবন তার বাইরে নয়, বাইরে হতে পারে না। সুন্দরবন দফতরের বর্তমান মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা জানালেন, তাঁদের সরকার সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম, ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন দফতর ইউএনডিপি-র সহযোগিতায় ২০০৩ সালে সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবিকার্জনের দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা রূপায়ণের লক্ষ্যে এই রাজ্যের বনদফতরকে একটা মাস্টার প্ল্যান বানানোর দায়িত্ব দিয়েছিল, যা আজো তৈরি হয়নি। মন্ত্রী সম্ভবত সেই মাস্টার প্ল্যানের উল্লেখ করলেন। এভাবেই সরকারি দীর্ঘসূত্রিতায় অন্যান্য অঞ্চলের মতো সুন্দরবনও আবদ্ধ হয়ে আছে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যকে সম্বল করে পুঁজি আর ক্ষমতার খেলা চলছে।

সুন্দরবন ও সুন্দরবনের মানুষ ২৪ পৃষ্ঠার পর

ছাত্রছাত্রীদের সিংহভাগ সুন্দরবনের। এই এলাকাগুলোর ধানজমি প্লটে বিক্রি হয়ে রাতারাতি সুন্দরবনের নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত মানুষে ভরে গেছে। আর '৭০-র দশকের পরে রেললাইনের ধার, খালপাড় থেকে পূর্ব-কলকাতার অপরিচ্ছন্ন জায়গা— যেখানেই বস্তি গড়ে উঠেছে জানবেন তারা বেশিরভাগই সুন্দরবনের মানুষ।

গত এক দশকে এ দৃশ্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। হাজার হাজার যুবক চলে যাচ্ছে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, আমেদাবাদ, সুরাট, গুরগাঁও আর আন্দামানে-নিকোবরে। গারমেন্টস, অটোমোবাইল সহ অন্যান্য শিল্পে, সোনার কাজ কিংবা জরির কাজ করতে এবং নির্মাণ শিল্পের শ্রমিক হিসেবে। অন্য জেলায় মানুষ যাচ্ছে চাষের কাজে খেতমজুর হিসেবে। ১৫-২০ দিনের জন্য কলকাতায় তাঁবু ফেলে থাকছে রোড কনস্ট্রাকশন আর জলের লাইনের কাজ করতে এসে।

সুন্দরবনে বৃদ্ধ এবং শিশুদের অনুপাত বাড়ছে যুবকদের তুলনায়। ভেড়ি আর ইটভাটার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মহিলাদের মীন ধরা আর পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে ইটভাটার শ্রমিক হিসেবে সুন্দরবনের মাটিতে জীবিকা তৈরি হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচুর এনজিও সুন্দরবনের প্রায় সর্বত্র সক্রিয়। তাদের হাত ধরেও কর্মসংস্থান হচ্ছে কিছু মানুষের। এনআরইজিএ-এর প্রকল্পের হাত ধরে পুকুর খনন, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা উঁচু করার কাজও মিলেছে কারো কারো। নির্মম হলেও এটা বাস্তব যে গত একদশকে সুন্দরবনে নারী পাচার বহুগুণে বেড়ে গেছে। লোকজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোকসংস্কৃতিকেও পেশা হিসেবে গ্রহণ করছে কেউ কেউ। কেরোসিনচালিত ইঞ্জিনভ্যান কিংবা সাধারণ ভ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবহন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে কেউ কেউ।

আংশিক কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুন্দরবনের সমস্যা গভীরতার সাথে অনুধাবন করে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যান নিতে হবে। সস্তা শ্রমিকের ভাণ্ডার হিসেবে না দেখে যদি সুন্দরবনকে তার প্রাকৃতিক সম্পদ আর মানবসম্পদের ওপর আত্মনির্ভর করা যায় তবেই সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট সম্ভব। নতুবা ইতিহাস-সমৃদ্ধ, জৈববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ, মানবসম্পদ-সমৃদ্ধ সুন্দরবন পুঁজিবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনে ধ্বংস হয়ে যাবে।

তথ্যসূচি

সমকালের জীয়নকাঠি : সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস, সুকুমার সিং

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ইতিহাস: অতীত, কালিদাস দত্ত

A Statistical Account of Bengal (Sundarban), W W Hunter

হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি, গোলাম মুরশিদ

স্যার ড্যানিয়েল ও গোসাবার আখ্যান, সৌমেন দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ : দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিশেষ সংখ্যা

অনীক ও দীপংকর চক্রবর্তী : অর্ধশতক পরিক্রমা

শুভাশিস

বাংলাভাষার এক সুপরিচিত কবি লিখেছিলেন যে সংঘ ভেঙে যাওয়ার সময়কাল এক দশক। দীপংকর চক্রবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে একটি পত্রিকার সংগঠন ধরে রাখলেন, 'এক ভেঙে দুই' হওয়ার কৃষ্টির বিপক্ষে। ঘনিষ্ঠ মহলে প্রায়ই বলতেন, পত্রিকা পঞ্চাশে পা রাখলেই স্বেচ্ছা-অবসর নেবেন। মূর্তিমান ব্যতিক্রম এই মানুষটির সম্পাদক-জীবনকাল আমাদের অনেকেরই কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে প্রৌঢ় হওয়ার যাত্রাপথ।

পুনশ্চ থেকে *অনীক*— এই পরিক্রমা ছিল স্বল্প দৈর্ঘ্যের। পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকা রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনে *পুনশ্চ* পরিবর্তিত হয় *অনীক* হিসেবে।

১৯৬৪-র যে সময়ে *পুনশ্চ*-র জন্ম হয়েছিল অনেক বলা-না-বলা কথা নতুন করে উপস্থাপিত করার জন্য, সেই টালমাটাল সময় *অনীক*-এর সাথী হয়ে থেকেছে। ভিয়েতনামে মার্কিন প্রত্যক্ষ হানাদারির অবসানের সাক্ষী যেমন এই পত্রিকাটি, তেমনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ারও সাক্ষী থেকেছে *অনীক*। *অনীক*-এর জীবনকালে ঘটেছে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশে 'মুক্তিযুদ্ধ', অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা, ভারতের বুকে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা; অন্যদিকে চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত যুদ্ধ, কিসিংগারের পিংপং কূটনীতি, ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, মাও-এর মৃত্যু এবং উইলিয়াম হিন্টনের ভাষায় চীনের 'বিরাট বিপরীত যাত্রা'।

যে সমস্যা-সংকুল কঠিন যাত্রাপথে *অনীক*-এর পদচারণা, ইতিহাসের সেই বঙ্কিম গতিপথ সমসাময়িক কালের বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উত্তাল দিনগুলিতে সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র মান্যতা পাচ্ছে, পাশাপাশি প্রচার চলছে 'বিপ্লবের বাড়াবাড়ি' নিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার নানা বিচ্যুতি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এই অবস্থায় *অনীক* বজায় রেখেছে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। *অনীক*-এর পঞ্চাশ বছরের স্মৃতিচারণা তাই একদিক থেকে দেশ-জাতি-পৃথিবীর চলমান সময়কে ছুঁয়ে যাওয়ার ইতিহাস। অনীক-এর সম্পাদকের কানে হয়ত বাজতো মায়কভৃস্কির সেই অমর পংক্তি: ''এই তো সময় কথা বলবার! যুগ, ইতিহাস আর সৃষ্টির উদ্দেশে।''

পুনশ্চ-র আবির্ভাব ছিল সামাজিক বাস্তবতা চিত্রিত করার সৎ সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক হিসেবে। প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল : ''সীমিত ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে তাই আমরা মানবিক মূল্যবোধ ও সুস্থ জীবনচেতনাকে বাঁচিয়ে রাখতে আগ্রহী। এবং আশাবাদী। অসুস্থ জীবনের অসুস্থতা ও অবক্ষয়ী চেতনার দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করতে রাজি নই আমরা।'' দ্বিতীয় সম্পাদকীয়তে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়, ''জটিল নিঃশ্বাসী অস্থানিক বর্তমানের কোলে বসে সেই বর্তমানের দশককেই অস্বীকার করে গতানুগতিক ও স্থানিক রীতির সাহিত্য রচনায় বা যুক্তিহীন প্রচণ্ড ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যায় ভেসে যেতে আমাদের প্রচণ্ড অনীহা।''

ষাটের দশকের মধ্যভাগ নানা দিক থেকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সময়। *পুনশ্চ* ও পরবর্তীকালে *অনীক* সেই বিক্ষুব্ধ সময়ের অভিঘাত বহন করেছে। সৎ ও বাস্তবমুখী সাহিত্যকর্মে নিবেদিত পত্রিকাটি ক্রমশ বাস্তবের রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে, সচেতনভাবেই। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণ, সাহিত্যকে সমাজের গতিশীলতার নিরিখে বিচারের আয়োজন চলে পত্রিকার পাতায়। এমনকি প্রথমবার কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর একটি সময়ে নানান উপদলীয় সংঘাতের ছায়াপাতও ঘটে পত্রিকার পাতায়।

সমাজ পরিবর্তনের মত ও পথ নিয়ে চিরন্তন বিতর্কে *অনীক*-এর সাগ্রহ যোগদান সচেতন পাঠকের চোখ এড়ায় নি। সেই প্রাথমিক পর্বেই *অনীক*-এ প্রকাশিত হয়েছে ভিয়েতনাম নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ। নিয়মিতভাবে পত্রস্থ হয়েছে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে আকর লেখাপত্র। নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ ঘটার আগেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির 'চীনপন্থী' অংশটির বিভ্রান্তিকে *অনীক* চিহ্নিত করে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। অন্যদিকে নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহকে স্বাগত জানাতেও *অনীক*-এর দ্বিধা ছিল না।

সত্তরের গোড়ায় একটি সৎ বাস্তবমুখী সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক থেকে *অনীক*-এর যৌক্তিক উত্তরণ ঘটে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিকে। এর পর *অনীক* আর পিছন ফিরে তাকায় নি। সময় যত জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, সময়ের দাবি মেনে আন্দোলনের দাবির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে *অনীক* তার বিষয়-বৈচিত্র্য সাধ্যমত প্রসারিত করেছে। ধরার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন মত আর মতের পেছনে ক্রিয়াশীল সমাজ-রাজনীতির দর্শনটির মৌলিক দিকগুলিকে। বাম-দক্ষিণ চলনের যে চক্রবৎ গতিতে আজকের বাম রাজনীতি প্রায় সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে বলা যায়, *অনীক* সেই আবর্ত এড়িয়ে চলার সচেতন প্রয়াস চালিয়েছে তার জন্মলগ্ন থেকেই।

এই সময় অনীক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাও সেতুঙের নেতৃত্বাধীন চীনের দৃঢ় সমর্থক। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পটভূমিকায় সে সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা প্রবন্ধ এ সময়ে *অনীক*-এর

সিংহভাগ দখল করে ছিল। পাশাপাশি চীনের সাংস্কৃতির বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় চীনে রচিত চিন চিং মাই-র প্রেরণাসঞ্চারী উপন্যাস *বিপ্লবের গান* নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো ১৯৬৯-৭০ সালে। এটি যে কত পাঠককে বিপ্লবের পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলাদেশ নিয়ে আতিশয্য চলছে। ১৯৭১-এর মে-জুন মাস। 'পূর্ববাংলা' সংখ্যা *অনীক*-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। হলুদ মলাটের দ্বিতীয় সংস্করণ 'পূর্ববাংলা' সংখ্যা অনীক প্রকাশিত হলো। একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধের শিরোনাম— 'আমি ইতিহাস বলছি : শেখ মুজিবকে চিনুন'। ইতিহাস-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতিহাসের উপাদান কীভাবে ব্যবহার ক'রে, কিংবদন্তীর আবরণ উন্মোচন ক'রে, মিথ্যার ইমারত ভূলুণ্ঠিত ক'রে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা যায়, তার এক অনবদ্য প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ ঘটলো।

১৯৭২-এর জুলাই থেকে *অনীক* মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হলো। 'যুগ যুগ জিও'-র উচ্চকিত অত্যাচার এড়িয়ে, নব কংগ্রেসি কৃষ্টি উপেক্ষা করে *অনীক* নির্ভীকভাবে তার নিয়মিত আত্মপ্রকাশ বজায় রাখলো। এই সময় প্রকাশিত স্বর্ণ মিত্র-র *গ্রামে চলো* উপন্যাসটি কমিউনিস্ট বিপ্লবীমহলে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল।

প্রতিদিন কলকাতার রাস্তায় খুন, যুবকের মৃত্যু। পুলিশ 'সন্দেহ'-র বশে গুলি করে হত্যার ঢালাও অধিকার পেয়েছে। একদিকে সমর সেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনি দিয়ে সমালোচনা চালাচ্ছেন, অন্যদিকে *অনীক*।

১৯৭২-এর ডিসেম্বর। বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ' বিজয়ী। বাঙালীয়ানার জয়জয়কার। সাজানো বিধানসভায় নানান হুল্লোড়বাজির আয়োজন পাকা। আইন পরীক্ষায় ব্যাপক টোকাটুকি। রেশনে কেলেংকারি— সঙ্গে ওয়াংচু কমিটির রিপোর্ট— মন্ত্রীসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দ খাদ্যের চোরাকারবারে লিপ্ত। ভারত-সোভিয়েত সামরিক চুক্তি গোপনে সাধিত; ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি সদ্য-নির্মিত বাংলাদেশকে ভারতের প্রায় উপনিবেশে পর্যবসিত করেছে। ডিসেম্বর ১৯৭২-এ *অনীক*-এ প্রকাশিত হলো দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা বাংলাদেশ ভ্রমণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের নিষিদ্ধ প্রায় সমস্ত বামপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে প্রকাশিত রিপোর্টটি আজও দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে গবেষকদের প্রয়োজন হয়।

১৯৭৩-এ মুক্তিসূর্যের ছটা পশ্চিমবাংলার মানুষকে তার তীক্ষ্ণ রশ্মি দিয়ে বিদ্ধ করছে। কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় বুলেটবিদ্ধ 'সমাজবিরোধী-সন্ত্রাসবাদী'রা। এপ্রিল ১৯৭৩। *অনীক*-এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো— 'প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী কারা?' *অনীক*-এর নবীন পাঠককুল ততদিনে দীপংকর চক্রবর্তীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদে পড়তে শুরু করেছেন 'চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে লং মার্চ-এ'। প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭৩-এর জানুয়ারি সংখ্যায়।

১৯৭৩-এর মে-জুন এ প্রকাশিত হলো *অনীক*-এর দশ বছরের গল্প-কবিতা সংকলন। দুটি অনবদ্য সম্পাদকীয় ছিলো সেই সংকলনে। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় যারা নিতান্তই বালক, যাদের স্মৃতিতে কেবল বিদ্যালয় অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ থাকার স্মৃতি ছাড়া প্রায় কিছুই নেই, তারা প্রথম 'ভুবনবাবুর' হাত ধরে সেই সময়ের আখ্যানসহ পূর্ণ অবয়বটির একটি আবছা পুনর্নির্মাণ পেয়ে যায়। নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ ঘটার বছরেই উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো ব্রজেন মজুমদারের লেখা গা-ছম ছম করা হৃদয়বিদারক আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক গল্প— 'খোদহাটির ডাক'। সেই গল্পের পুনর্মুদ্রণ করে *অনীক* একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে।

জুলাই ১৯৭৩-এ তরুণ রায় লিখলেন : 'ভারতীয় পুঁজিবাদ 'স্বাধীন'?'। সঙ্গে রইলো *ফ্রন্টিয়ার* পত্রিকায় প্রকাশিত প্রভাত জানা-র নকশালবাড়ি আন্দোলনের পিছু-হটা নিয়ে আত্মসমীক্ষা-মূলক দীর্ঘ প্রবন্ধ : 'নকশালবাড়ি ও তারপর'।

গণ-আন্দোলনে স্থবিরতা, দরবারি বামপন্থী নেতৃবৃন্দ হিমঘরে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পূর্ণ নৈরাজ্য বিরাজমান। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর উল্টোদিকে পুলিশ একদিন জোর করে বাদল সরকারের পথ-নাটিকা বন্ধ করে দিয়ে গেলো। গণ-নব-সুস্থ নাট্যপন্থী কোনও দলই এই অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হলেন না। বাদল সরকার এবং আরও কয়েকটি ছোট নাট্যগোষ্ঠী প্রতি শনিবার কার্জন পার্কে নাটক করা শুরু করেন। প্রখ্যাত গণসঙ্গীত গায়ক এবং গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা হেমাঙ্গ বিশ্বাস মোহন মুর্মু ছদ্মনামে লিখলেন : 'সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ-সমস্যা' (ডিসেম্বর, ১৯৭৩)। তার আগে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর বিশেষ সংখ্যায় অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ : 'ভারত-চীন : দুই অর্থনীতির দুই পথ' লিখেছেন তরুণ রায়। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে সেই প্রবন্ধ প্রবল উৎসাহের জন্ম দিয়েছে।

১৯৭৪ সাল ভারতে বিপর্যয়-এর ইশারা নিয়ে হাজির হলো। এই বছরে ঘটেছিল প্রথম পোখরান আণবিক বিস্ফোরণ, রেল ধর্মঘট, দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন এবং জরুরি অবস্থার পদধ্বনি। বছরের গোড়াতে ভারত সফরে এলেন রাশিয়ার ব্রেজনেভ, দরাজ হাতে প্রশংসাপত্র বিতরণ করলেন ইন্দিরা গান্ধীকে। জানুয়ারি ১৯৭৪-এ তরুণ রায় লিখলেন, 'নয়া জারের ভারত সফর'। সুন্দরায়া-র ব্রেজনেভ সফর নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনায় ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ-এ প্রকাশিত হলো তরুণ রায়-এর দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ: 'সুন্দরাইয়া : রুশ নয়া জারদের নয়া উকিল' (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) এবং 'সুন্দরাইয়া-র বিপ্লব চর্চা' (মার্চ, ১৯৭৪)। মে দিবস নিয়ে প্রকাশিত হলো এক অসাধারণ সম্পাদকীয়। ইতিমধ্যে শুরু হলো রেল ধর্মঘট, ঘটলো পোখরানে আণবিক বিস্ফোরণ এবং শনিবার, ২০শে

জুলাই, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবসে কার্জন পার্কে নাটকের ওপর পুলিশি হামলা। নিহত হলেন নাট্যপ্রেমী দর্শক তরতাজা যুবক প্রবীর দত্ত। ২০শে জুলাই-এর কালবেলাতে কার্জন পার্কে উপস্থিত ছিলেন *অনীক* সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী। এই বিষয়ে তাঁর ভূমিকা পরবর্তী সময়ে নানাজনের স্মৃতিচারণে জানা গেছে। *অনীক*-এর পাতায় প্রকাশিত হয়েছে কার্জন পার্কের ঘটনা নিয়ে নানান সুচিন্তিত মতামত (জুন-জুলাই ১৯৭৪)।

রেল ধর্মঘট নিয়ে (জুন-জুলাই ১৯৭৪), আণবিক বোমা নিয়ে (অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৭৪), নিক্সনের পদত্যাগ নিয়ে (সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) লেখা প্রকাশিত হয়েছে। *অনীক* এবং তাঁর সম্পাদকের বিস্তৃত দৃষ্টিকোণের পাল্লার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক কোনও রাজনৈতিক ঘটনাই ধরা না দিয়ে পারেনি।

এর মধ্যেই জুন-জুলাই-তে প্রকাশিত হয়েছে বিতর্কিত 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' সংখ্যা। বিনা বিচারে, বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে আটক রাখা হয়েছিলো, সেই হতভাগ্য রাজবন্দীদের কথা বৃহত্তর সমাজে প্রচারিত হওয়ার কোনো মাধ্যম ছিলো না। *অনীক* নিয়মিত ভাবে এই সমস্ত বন্দীদের আদালতে দেওয়া জবানবন্দী ছাপত। কখনও কখনও রাজবন্দীরা *অনীক*-এ প্রকাশ করার জন্য চিঠিও পাঠাতেন। সারা পৃথিবীর বিবেকবান ব্যক্তিরা ভারতীয় জেলে বন্দীদের দুর্দশা নিয়ে এক বিবৃতি দেন। *অনীক* পত্রিকায় তা 'জাগ্রত বিশ্ব-বিবেক' নামে প্রকাশিত হয়।

বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য প্রয়াত হলেন। তাঁর সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী লেখা লিখলেন দীপংকর চক্রবর্তী (মার্চ ১৯৭৫)। সিকিম ঘিরে ভারত সরকারের আগ্রাসী তৎপরতার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক উন্মোচন করে প্রকাশিত হলো 'ভারতের সিকিমগ্রাস', 'সিকিম কি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ', 'আজকের সিকিম', 'ভারত-সিকিম এবং চীন' এবং 'সিকিম প্রসঙ্গে চীন সরকারের বিবৃতি'। প্রবীণ গণসঙ্গীত শিল্পী পরেশ ধরের কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত হত্যার পটভূমিতে রচিত অসাধারণ গান, 'একফালি কার্জন পার্কের সবুজে...' ও তার স্বরলিপি প্রকাশিত হলো। ছদ্মনামে দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন কার্জন পার্কের ঘটনা নিয়ে অঙ্গনমঞ্চ ও প্রসেনিয়াম আঙ্গিকে অভিনয়যোগ্য নাটক, 'বিশে জুলাই-এর বিচার' (এপ্রিল-মে, ১৯৭৫)। বাংলার জেলায় জেলায় প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাগুলি এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে লাগলেন।

দীপংকর চক্রবর্তী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখার সময় অনীক-এর পাতায় বেশ কয়েকটি ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তরুণ রায় নামে লিখতেন রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী। রাজনৈতিক মন্তব্য বা ভাষ্য লেখার জন্যও তাঁর কয়েকটি ছদ্মনাম ছিল। নাটকও লিখেছেন ছদ্মনামে।

ছোট সংবাদপত্র, ছোট পত্রিকার ওপর হামলা বাড়ছে। সংবাদপত্রের ওপর হামলার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো *অনীক*-এর পাতায় (এপ্রিল-মে ১৯৭৫)। সারা দেশ তখন প্রকাশ্য ও গোপন কারাগারে রূপান্তরের পথে। উৎপল দত্ত-র 'দুঃস্বপ্নের নগরী' জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, নাট্যকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মে মাসে হাওড়া জেলে ভয়াবহ হত্যাকান্ড সংগঠিত হলো, জয়প্রকাশের আন্দোলন তুঙ্গে, ইন্দিরাজির নির্বাচন বাতিল ঘোষণা। *অনীক* স্পষ্টতই বিপদের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো। ২৫ শে জুন রাত্রে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রাক্কালে জুন সংখ্যা (১৯৭৫) সম্পাদকীয়তে অনীকের ঘোষণা, "ঝড় আসছে"। লাল মলাটের উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হাত সহ প্রচ্ছদে বক্স করে লেখা 'সময়ের দাবি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন'— এই মর্মে এক আহ্বান। আশঙ্কা মতো ঝড় সত্যিই উঠলো। উথাল-পাতাল করা দামাল হাওয়া, এক ঝটকায় গণতন্ত্রের সাজানো রঙিন পলকা সামিয়ানা উড়ে গিয়ে বেয়নেটের উলঙ্গ মূর্তি উন্মোচিত হলো।

জুলাই মাসে *অনীক* সম্পাদক দীপংকর চক্রবর্তী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য সুকান্ত রাহা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। একটি আইনি পত্রিকা, আইনসঙ্গতভাবে কিন্তু সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করার জন্য পত্রিকার উপর আঘাত নেমে এলো গণতান্ত্রিক ভারতে। পত্রিকাকে সরকারিভাবে কোনও দিনই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। দীপংকর চক্রবর্তীদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি-দেওয়ানি বিধি লঙঘনের মামলা দায়ের করাও সম্ভব ছিলো না। তাই তাঁদের কপালে জুটলো বিনা বিচারে আটক আইন ডিআইআর, পরে মিসা। *অনীক* প্রকাশ বন্ধ হলো আপাতত। দীর্ঘ উনিশ মাসের গর্ভযন্ত্রণার পর অনীক আবার ভূমিষ্ঠ হলো— নতুন অবয়বে, নতুন মুখের সমাহারে। শুরু হলো *অনীক*-এর আবার পথ চলা।

১৯৭৭ সালের আগস্ট মাস থেকে *অনীক* আবার নব কলেবরে প্রকাশিত হতে শুরু করলো। দীপংকর চক্রবর্তী বুঝেছিলেন যে একজন সম্পাদক থাকলে রাষ্ট্রীয় হামলার মুখে পত্রিকা প্রকাশে ছেদ পড়তে পারে— বিশেষত *অনীক*-এর মতো পত্রিকার সম্পাদকের তো 'রাজদ্বারে অতিথি'-যোগ প্রায় নিশ্চিত। তাই দুই সম্পাদকের যুগলবন্দীতে *অনীক* অচিরেই তার ফেলে যাওয়া স্থান দখল করলো। পুনঃপ্রকাশের প্রথম সংখ্যাতেই শেষ প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'ঝড় আসছে' দিয়ে *অনীক*-এর নতুন যাত্রা শুরু হলো। সদ্য কারামুক্ত দীপংকর চক্রবর্তী বন্দীমুক্তি নিয়ে নানান সরকারি টালবাহানা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ এবং শর্তারোপের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন।

মাও সেতুঙের মৃত্যুর সময় ভারতে জরুরি অবস্থার দমবন্ধ করা আবহাওয়া। বিভিন্ন কারাগারে রাজবন্দীরা তাঁর মৃত্যুকে স্মরণে রেখে বিভিন্ন শোকসভা করলেও, সেই সময়ে জেলের বাইরের বৃহত্তম জেল, আমাদের এই দেশ ভারতে মাও-এর স্মরণে বিশেষ কিছুই করা যায়নি। অনীক প্রকাশিত হওয়া শুরু

হতেই প্রকাশিত হলো মাও-সে-তুং নিয়ে বিশেষ সংখ্যা, 'প্রসঙ্গ : মাও'। সৃজন সেন লিখলেন, 'মরিয়াছে ব্যাটা, চুকিয়াছে ল্যাটা...'! দীপংকর চক্রবর্তীর অনবদ্য অনুবাদে প্রকাশিত হলো কুয়ো মো জো এবং মাও-এর কবিতা, এবং তাঁর শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা।

১৯৭৮-এর বিশেষ সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর) প্রকাশিত হলো দীপংকর চক্রবর্তীর সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত মূল্যায়ন। এর যুক্তি, তথ্য এবং তাত্ত্বিক কাঠামো এতই মজবুত ছিলো যে তা অনায়াসেই পাঠকের মর্মে প্রবেশ করে। বামপন্থী সংস্কৃতি-রাজনীতি চর্চায় যে ব্রিটেনের চোখ দিয়ে ভারতের সমাজবাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টার ঘরানা প্রথমাবধি বহমান, এই প্রবন্ধটি সেই পথটি সযত্নে এড়িয়ে চলেছে।

১৯৭৮ সালে অনীক নকশালবাড়ি আন্দোলনের এক দশক পূর্তিতে এই আন্দোলনের এক মূল্যায়ন করে। আপাতদৃষ্টিতে নকশালবাড়ি আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তার সঠিকতা ও তার ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কাম্পুচিয়ায় আন্দোলন চলছে, পোল্যান্ডে চলেছে উথাল-পাথাল। ঘরের পাশে আসাম উত্তপ্ত, চীনে চলছে 'চারচক্রীর বিচার'। বিমান ভেঙে পড়ে মারা গেলেন সঞ্জয় গান্ধী। প্রতিটি ঘটনাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ *অনীক*-এর পাতায় স্থান পেলো।

১৯৮১-র বিশেষ সংখ্যা ছিলে 'অগ্নিযুগ'। অশোক রুদ্র মহাশয় লিখলেন 'অগ্নিযুগ ও মধ্যবিত্ত মন'।

বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেও পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী রাজনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় পীড়নের প্রথম তরঙ্গ আছড়ে পড়েছে। কৃষক-বিপ্লবী দুর্গা বাস্কে কুখ্যাত বহরমপুর জেলে আটক। বন্দীমুক্তির তালিকায় তাঁর নাম উঠছে না। সরকার বিবৃতি দিচ্ছে, ''আমলাদের একাংশের অসহযোগিতার জন্য'' এই ঘটনা। প্রায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হলো দুর্গা বাস্কের। *অনীক*-এ প্রকাশিত হলো এই বিষয়ে এক তীব্র প্রতিবেদন।

১৯৮২-র এপ্রিল সংখ্যায় এই বিষয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধে ক্ষুরধার সমালোচনা প্রকাশিত হলো। বিপ্লবী কানাই চ্যাটার্জীর মৃত্যুও *অনীক*-এর চোখ এড়িয়ে যায়নি। ১৯৮২-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা চীন বিষয়ে একগুচ্ছ বিতর্ক প্রকাশিত হলো। আন্তর্জাতিক স্তরে তখন বেটেলহাইম-এর লেখা নিয়ে চীন-বিষয়ক বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

১৯৮৩-র যে বিশেষ সংখ্যাটি পাঠকদের নজর পড়েছিলো তা হলো বাংলার রেনেসাঁস নিয়ে সুচিন্তিত এবং সুগ্রন্থিত একগুচ্ছ মৌলিক মূল্যায়ন। দীপংকর চক্রবর্তী এবং তরুণ রায়-এর যে দুটি প্রবন্ধ মননশীল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো সেদুটি যথাক্রমে 'বাংলার 'রেনেসাঁস' : মূল্যায়ন ও ফলশ্রুতি' এবং ঐ বছরেরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় 'তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি'। জুন সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতি-বিষয়ক অশোক রুদ্র এবং রঙ্গলাল দাশগুপ্তের বিতর্ক রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে আজও শিক্ষণীয় ভূমিকা পালন করছে।

বামফ্রন্ট থিতু হয়ে 'সংগ্রামের হাতিয়ার'-এর চেয়ে পীড়নের হাতিয়ার হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সারা দেশ জুড়েই পুলিশি বর্বরতা বাড়ছে। নকশাল নিধন নতুন করে শুরু হয়েছে। *অনীক* সরব এই বর্বরতার বিরুদ্ধে। পুলিশি লকআপে মৃত্যু, বিনা বিচারে আটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী উদ্যোগের সামনের সারিতে আবার *অনীক*-এর উপস্থিতি। ১৯৮৪ সালে প্রয়াত হলেন সত্যনারায়ণ সিং এবং চন্দ্র পোল্লা রেড্ডি। *অনীক*-এ এঁদের নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলো। তরুণ রায় বামফ্রন্টের রাজনীতির বিচার করার জন্য কলম ধরলেন। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪-তে প্রকাশিত হলো 'পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার'। ডিসেম্বরে ঘটলো কুখ্যাত ভূপাল গ্যাসকাণ্ড। অনীক লিখলো 'ভূপালে গণহত্যা'(ডিসেম্বর ১৯৮৪)।

১৯৮৫-এ বামফ্রন্টের রাজনীতির অন্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে দীপংকর চক্রবর্তী এবং তরুণ রায় ক্রমাগত লিখে চললেন ''সিপিআইএম এবং নির্বাচনের কানাগলি' (মনে রাখা দরকার, 'ভোট বয়কট'-এর রাজনৈতিক শ্লোগানের সেই উত্তাল দিনগুলিতেও *অনীক* বয়কটকে নীতির প্রশ্ন বলে মনে করেনি), '১১২ ধারার মার্কসবাদ'। পাশাপাশি রইলো 'কংগ্রেস ও ভারতীয় রাজনীতি', 'কংগ্রেস এবং গান্ধী-নেহরু-সুভাষচন্দ্র'। প্রয়াত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সংখ্যা প্রকাশিত হলো অনেক মূল্যবান স্মৃতিকথা-মূলক লেখা নিয়ে।

১৯৮৬ সালের কথা উঠলেই জাতীয় ক্ষেত্রে মনে পড়ে আরোয়াল হত্যাকান্ড আর রাজ্যের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য এবং আবার নতুন করে বন্দীমুক্তির প্রশ্ন। তিনটি বিষয় নিয়েই *অনীক* এপ্রিল, জুন এবং জুলাই সংখ্যায় অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপে।

পেরুর জনযুদ্ধ, স্পেনের গৃহযুদ্ধের ৫০ বছর— এই দুটি বিষয়ে অনীক গুরুত্ব দিয়ে মৌলিক বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ ছাপে। দলিত বিষয়ক যে কোনো আলোচনাই চলতি বামপন্থী ঘরানার অনুশীলনে লিপ্ত ফলিত রাজনীতিকদের কাছে প্রায়-অচ্ছুৎ। *অনীক* প্রকাশ করলো দলিত সংগ্রাম সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৬)। ড: বিজয় বসুর প্রয়াণে *অনীক*-এর পাতায় প্রকাশিত হলো দীপংকর চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণা মূলক লেখা।

১৯৮৭-তে বামফ্রন্টের দশ বছর পূর্ণ হলো। অনীক-এ দীপ্তি চন্দ লিখলেন 'জ্যোতি বসুর 'বঙ্গদর্শন''। এই বছরটি বাংলার সংস্কৃতি জগতে ইন্দ্রপতনের বছর। প্রয়াত হলেন সমর সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস। দুজনকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো । বামফ্রন্টের দশ বছর নিয়ে বিশেষ সংখ্যার অভিনবত্বের জন্যই তা পাঠককুলে সাড়া জাগায়। বামফ্রন্ট সরকারের দশ বছর নিয়ে সাংবাদিক থেকে অধ্যাপক, আন্দোলনের কর্মী থেকে

সম্পাদক, এক কথায় সমাজের বিভিন্ন বর্গ থেকে চিন্তাশীল মানুষদের বেছে নিয়ে তাঁদের মতামত আহ্বান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যাও করা হয় সে বছর (এপ্রিল-মে, ১৯৮৭)।

সিপিআইএম ঘরানার গণতন্ত্রে মানুষ ক্রমশ বিব্রত হচ্ছে। এর মধ্যেই পুলিশের হাতে অত্যাচারিত অর্চনা গুহ মামলায় সরকারি মদতে জটিলতা শুরু হলো। *অনীক*-এর প্রতিবাদ ছিলো তীব্র। গর্বাচভের গ্লাস্‌নস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকার গুঁতোয় রাশিয়া ভাঙনের মুখে— তৃতীয় ধারার রাজনীতিও গর্ভাচভের পদক্ষেপগুলিতে বিভ্রান্ত। তরুণ রায় লিখলেন, 'মহাবিতর্কের আলোয় গর্বাচভের 'সমাজতন্ত্র''।

১৯৯০-এ প্রকাশিত হলো বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা। দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি'। ভূপাল নিয়ে, ভি পি সিং-এর বিদায় নিয়ে, গ্রানাডা বা পানামা আক্রমণ নিয়ে বিশ্লেষণ প্রকাশিত হলো। মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা নিয়েও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন: 'সাম্প্রদায়িকতা, ভারতীয় সমাজ ও সাম্প্রতিক রাজনীতি'। চেরাবান্দা রাজু-কে স্মরণ করার বিষয়টিও যত্ন নিয়েই করা হয়।

১৯৯১-এর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিলো 'আজকের ভারত ও জাতীয়তার সমস্যা'। তরুণ রায় লিখলেন, 'আজকের ভারত এবং জাতীয়তার সমস্যা'। পূর্ণেন্দু মজুমদার স্মরণে লিখলেন মহাশ্বেতা দেবী। বাংলাদেশ এবং পূর্ব ইউরোপ নিয়ে লিখলেন বদরুদ্দীন উমর।

১৯৯২-এ 'বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষের' ২৫ বছর পূর্ণ হলো। *অনীক* এই বিষয়ে অনেক লেখা ছাপলো। তরুণ রায় লিখলেন ''৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং কিছু প্রশ্ন'। গড়পড়তা পাঠ্যবইতে পাওয়া তথ্য এবং তত্ত্ব বা কমিউনিস্টদের চিরাচরিত বিশ্লেষণের চোঁয়া ঢেকুর নয়— সতেজ, সজীব এক ঝলক নির্মল বাতাস। সোভিয়েত পতনের সেই আসন্ন দিন থেকে চূড়ান্ত পর্যায় নিয়ে *অনীক* এই বছর ক্রমাগত মতামত ব্যক্ত করেছে। ভবদেব মন্ডলের অনন্য-সাধারণ মাটির-আঘ্রাণ-সম্পৃক্ত স্মৃতিকথা, 'ক্রান্তিকালের কথা : ডেবরার ডমরু ধ্বনি' পাঠকদের উপহার দিলো *অনীক*।

১৯৯৩-এ করন্দায় কমিউনিস্ট নিধনকে ধিক্কার জানিয়ে লেখা বের হলো। লেখা বের হলো নর্মদা আন্দোলন, ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন, সংঘ পরিবার নিয়ে। পেরুর সাইনিং পাথ, যুগোশ্লাভিয়ার সংকট থেকে শুরু করে রাহুল সাংকৃত্যায়ন, গনজালো এমন সব সমসাময়িক বিষয় *অনীক* পত্রস্থ করে এই বছর। অতীন্দ্র মজুমদারের প্রয়াণেও *অনীক* শ্রদ্ধা জানায়। দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দীপংকর চক্রবর্তী এক অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন। তসলিমা নাসরিন যখন এতটা 'নাম' হয়ে ওঠেননি, তখন তাঁকে নিয়ে অনীক-এর পাতায় লেখা প্রকাশিত হয়।

১৯৯২-এর বাবরি মসজিদের ক্ষত উপশম হওয়ার বদলে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে তা আরও বেড়ে চলেছে। কানোরিয়া আন্দোলন সংহত হচ্ছে— শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রায়শই বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে। কারখানা কারখানায় গড়ে উঠছে 'সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন' ধাঁচের সংগঠন। *অনীক* আগাগোড়া ছিল কানোরিয়া আন্দোলনের পাশে। যদিও আন্দোলন ও তার নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা চালাতে *অনীক* কখনও দ্বিধা দেখায়নি। *অনীক* ১৯৯৪ সালেই সম্পাদকীয়তে বলেছে, ''চাই সংহত আপসবিমুখ শ্রমিক সংগ্রাম'', ''আবার লড়াই-এর পথে কানোরিয়ার শ্রমিকরা'', বা দীর্ঘ প্রবন্ধ, ''ভিক্টোরিয়া থেকে কানোরিয়া''। গণনাট্যের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তরুণ রায় লিখলেন, 'গণনাট্য সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী', সুধী প্রধানের গণনাট্য সংঘের সংবর্ধনা প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত লেখাও পত্রস্থ হলো। মানবাধিকার লঙঘন অব্যাহত, অথচ মানবাধিকার সংগঠনগুলোতে উৎসাহের ঘাটতি। সমস্যার মূল যে দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত, তা চিহ্নিত করে দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ, 'মানবাধিকার আন্দোলনে দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা'। আন্তর্জাতিক স্তরে গ্যাট চুক্তি, ডুঙ্কেল প্রস্তাব এবং ভারতে তার প্রভাব নিয়ে অনীক লাগাতার প্রচার চালিয়েছে এই পর্বে। রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সমান তালে চলেছে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা। প্রয়াত কবি সমীর রায়কে নিয়ে ক্রোড়পত্র (এপ্রিল-মে, ১৯৯৪)। কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কমলেশ সেন, নবারুণ ভট্টাচার্য, শামসুর রহমান, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী দেব প্রমুখের। গল্প লিখেছেন অমর মিত্র, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৯৫ সাল মেদিনীপুর জেলে গণহত্যার পঁচিশ বছর। ঐ সময়ে জেলে অবস্থানকারী মেঘনাদ লিখলেন সেই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সে যুগের আন্দোলনের কুশীলব অরুণ বসু লিখলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও জনযুদ্ধের তত্ত্ব সংক্রান্ত সন্দর্ভ। কানোরিয়া আন্দোলন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। দেখতে দেখতে ফ্যাসীবিরোধী যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। তার বিশ্লেষণ করলেন সুচরিতা সেন। ভারত-ছাড়ো আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্র নিয়ে ক্রোড়পত্রে সুভাষ বসু এবং তৎকালীন আন্দোলন নিয়ে মৌলিক বিশ্লেষণ স্থান পেলো। সলিল চৌধুরীর দুটি সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হলো।

১৯৯৬-এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি ২৫ বছরে পদার্পণ করলো। তরুণ রায় রাষ্ট্রটির নানাদিক বিশ্লেষণ করে লিখলেন 'পঁচিশ বছর বাংলাদেশ', লিখলেন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়েও। ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো মানবাধিকার নিয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধ। দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন, 'মানবাধিকারের রাজনীতি''। লাগাতার দেশ, রাজ্য এবং বিদেশের মানবাধিকার লঙঘনের খবর, বিশ্লেষণ, রিপোর্ট প্রকাশ করে গেছে *অনীক*। ঝিমিয়ে পড়া, স্তিমিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের হাল দেখে ঐতিহাসিক পটভূমি

ও বিশ্লেষণের তাগিদে *অনীক*-এ প্রকাশিত হলো সুচিন্তিত প্রবন্ধ, ''৬৪ ও তৎপরবর্তী ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন', লেখক সুকান্ত রায়। এই বছর *অনীক* মানবাধিকার বিষয়ে একটি মূল্যবান ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহের একটি মৌলিক মূল্যায়ন উপহার দেন। প্রয়াত রাজনৈতিক কর্মী, সৎ সাংবাদিক ও ভাষ্যকার ভবানী চৌধুরীর মৃত্যুতে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

১৯৯৭-এ ভারতের 'শিশু গণতন্ত্র' হাঁটি হাঁটি পা পা করে ৫০ বছর পদার্পণ করলো। *অনীক*-এর সম্পাদকীয়, 'টুইডিলডাম থেকে টুইডলডি'! সিপিএম রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, পূজা কমিটির মাধ্যমে 'বিপ্লব', এসবই *অনীক*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্যে তীব্রভাবে ধিকৃত হলো। একদিকে যেমন রণবীর সেনার হামলা অব্যাহত, অন্যদিকে প্রকাশ্যে প্রবন্ধ লিখে ৭০-এর দশকের যুবক-নিধন, লকআপ-এ নারী নির্যাতনের প্রধান সেনাপতি রুণু গুহ নিয়োগীর আত্মজীবনীতে সমস্ত কুকীর্তির সাফাই গাওয়ার চেষ্টা। রুণুর এই অপচেষ্টাকে বিদ্ধ করে তরুণ রায় লিখলেন, ''কালো'র 'সাদা' হবার খোয়াব'। লেখাটি পরে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়ে পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের প্রচারে কাজে লাগানো হয়। সোভিয়েতের পতন, চীনের ভোলবদল, অন্যদিকে দেশীয় ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্বাচন-সর্বস্ব রাজনীতি অথবা নিষ্ফলা হিংসার পটভূমিতে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ছাত্র-যুব এবং রাজনৈতিক কর্মীদের চৈতন্যে আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়। উত্তর-আধুনিকতার মর্মবস্তু প্রত্যাখ্যান করে মার্কসবাদের পক্ষে কলম ধরলেন রতন খাসনবিশ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭)। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় ৫০ বছরের স্বাধীনতাকে নানা দিক থেকে বিচারের চেষ্টা চলে। তরুণ রায় লেখেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ও উপমহাদেশের রাজনীতি'। তেভাগার কিংবদন্তী নায়ক কংসারি হালদারের স্মরণে লেখা প্রকাশিত হয়।

১৯৯৮-এ বিজেপি দিল্লির মসনদে আসীন। দুই 'বিবদমান' পার্লামেন্টারি দল, কংগ্রেস ও বিজেপি একসঙ্গে ভোট দিয়ে গ্যাট চুক্তি মোতাবেক পেটেন্ট আইন সংশোধন করেছে। মার্কিন সংস্থার মতে বাসমতী চাল তাদের 'উদ্ভাবন', অতএব তাদের আবদার যে বাসমতী-র পেটেন্ট তাদেরই প্রাপ্য! বাসমতী পেটেন্ট নিয়ে বিতর্ক *অনীক*-এর চোখ এড়ায়নি।

বাজপেয়ী হুংকার দিয়ে পোখরান-২ আণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেন— দীপ্র চৌধুরী লিখলেন, 'আণবিক বোমা ও বিজেপি-র রাজনীতি'। বিশেষ সংখ্যায় রইলো মার্কসবাদ নিয়ে একগুচ্ছ লেখা। সুচরিতা সেন লিখলেন 'পোখরান চাঘাই ও হিরোসিমা দিবসের স্মৃতি'।

১৯৯৯-এর শুরুতে, '৮০-র দশকের নকশাল আন্দোলনের অন্যতম দলের সংগঠক বিনোদ মিশ্রকে নিয়ে লিখলেন রতন খাসনবিশ। হিন্দুত্ববাদ তার কুটিল ডানা মেলে ভারতের আকাশে তার কালো ছায়া বিছিয়ে নেমে আসছে। *অনীক* হিন্দুত্ববাদের প্রায় প্রতিটি উগ্র প্রকাশের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে। কয়েকজন পরিচিত প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে তাঁদের মূল্যায়ন প্রকাশিত হলো *অনীক*-এ। দীপংকর চক্রবর্তী তাঁর প্রথম জীবনের প্রিয় বিষয়, চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখা লিখলেন বেশ কয়েক দশক পর। ১৯৯৯-এর মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হলো তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধ, 'চলচ্চিত্রের রাজনীতি এবং আইজেনস্টাইন' (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৯৯)। কার্গিল উত্তপ্ত। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা ভারতীয় জওয়ানদের কাঁটা-ওয়ালা বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছে। *অনীক*-এর জুন, জুলাই ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১৯৯৯) কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে একগুচ্ছ লেখা প্রকাশিত হলো। তরুণ রায় স্মরণ করলেন চীন বিপ্লবের ৫০ বছরকে।

বিজেপি-বিপদ কাটেনি— বামপন্থীরা ছত্রভঙ্গ। সিপিআইএম -এর সংসদ-সর্বস্বতা নিয়ে একের পর এক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো পুরো ২০০০ সাল জুড়েই। মমতা ব্যানার্জী ততদিনে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতি বসু বিদায় নিলেন। টাডা কালাকানুন লাগু হয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ঘটলো ভয়াবহ বন্যা। বন্যার কারণ এবং তার ফলাফল বোঝার জন্য নদী-বিশেষজ্ঞদের জমায়েত করে *অনীক* একগুচ্ছ প্রবন্ধ প্রকাশ করলো। রতন খাসনবিশ 'মুক্ত অর্থনীতি'-র ফলে মানুষের বিপন্নতার রাজনীতি-অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলেন। তরুণ রায় গৈরিক ফ্যাসিবাদ ও বামপন্থীদের দিশাহীনতা নিয়ে লিখলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গৈরিক ফ্যাসিবাদ ও বামপন্থা' (মার্চ-এপ্রিল, ২০০০)। প্রকাশিত হলো অমর মিত্র-র উপন্যাস, 'নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান'। শৈবাল মিত্র-র 'নিলয়ের নিশিযাপন'।

২০০১— ভারতে বিলগ্নিকরণের যুগ। ছোট বুশ আবার ইরাক আক্রমণ করলো। বুদ্ধবাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 'উন্নততর বামফ্রন্টের' শ্লোগান তুললেন। দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন, 'সিপিআই(এম) কোন্ পথে?' সুকান্ত রায়ের বিশ্লেষণে উঠে এলো, 'কলকাতা থেকে তিরবনন্তপুরম্ : একটি সতর্ক 'দক্ষিণ' যাত্রা'', রতন খাসনবিশ লিখলেন, 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নয়া কর্মসূচী' (মার্চ-এপ্রিল, ২০০১)। আফগান যুদ্ধ বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করলে *অনীক*-এ পরপর প্রকাশিত হলো দীপংকর চক্রবর্তীর লেখা 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আফগানিস্থান যুদ্ধ', সঙ্গে সত্যেন সাহা ও অরুন্ধতী রায়ের প্রবন্ধ (ডিসেম্বর ২০০১)।

২০০২ বললেই গোধরা কাণ্ড, নরেন্দ্র মোদী আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সারা বছর হিন্দু সাম্প্রদায়িক এবং দাঙ্গা নিয়ে অনীক তার নিজস্ব বক্তব্য বজায় রাখে। বিজেপি ও সাভারকার নিয়ে লেখেন দীপ্র চৌধুরী। সিপিআই(এম) দক্ষিণ-যাত্রা অব্যাহত— দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন, 'গণতন্ত্র : বামফ্রন্ট স্টাইল' (জুলাই ২০০২), 'মতাদর্শগত লড়াই : সিপিআইএম স্টাইল'' (আগস্ট ২০০২)।

মৃণাল সেনের ছবি 'আমার ভুবন'-এর সমালোচনা লিখলেন দীপংকর চক্রবর্তী (ডিসেম্বর, ২০০২)। দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট, স্বাধীনতা সংগ্রামী, গণতান্ত্রিক অফিকার রক্ষা সমিতির সহ সভাপতি, আজীবন ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামে রত সকলের প্রিয় বীরেন দা, বীরেন রায় প্রয়াত হলেন — *অনীক* তাঁর জীবন-কর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করলো।

২০০৩-এ সুরেশদা, সুরেশ বিশ্বাস প্রয়াত হলেন— প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে লেখা নিয়ে আসা হলো। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ে লিখলেন ড: গৌরীপদ দত্ত। তরুণ রায় লিখলেন; 'ভারতে জাতীয়তাবাদ ও উল্টোরথের পালা', রতন খাসনবিশ লিখলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ'। ইরাক নিয়ে একগুচ্ছ লেখা প্রকাশিত হলো।

২০০৪ সালে ইরাক ছিলো ঘটনাবহুল। প্রতিনিয়ত সে দেশে মার্কিন হামলা আর গণ প্রতিরোধ। আবু ঘ্রাইব-এর কেলেঙ্কারি একদিকে, অন্যদিকে বামফ্রন্ট আমলে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর খণ্ডিত তালিকা প্রকাশ করলো *অনীক*। মনোরমার ঘটনা ঘটলো, মণিপুরের সাহসী মায়েরা প্রতিবাদ করলেন। *অনীক* তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো। প্রয়াত হলেন পল সুইজি। সুইজিকে নিয়ে আলোচনাসভা করা হলো অন্য পত্রিকার সঙ্গে একযোগে। সেই আলোচনাসভায় বিপুল সাড়া মিললো। বামফ্রন্ট আমলে যে পুলিশি সন্ত্রাস তাদের রাজত্বের শেষ পর্বের 'সিগনেচার স্পেশিফিকা' হয়ে উঠবে, ২০০৪ থেকেই সেই সন্ত্রাসের পারদ চড়ছে। দীপংকর চক্রবর্তী লিখলেন, 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং প্রশ্রয়ের ধারাবাহিকতা' (জুন, ২০০৪)। বনধ্ নিয়ে যে রাজনীতি অব্যাহত, ডিসেম্বরে সে বিষয়ে এক তীব্র সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলো। এই বছরের বিশেষ সংখ্যায় বর্তমান বিশ্বের বামপন্থী আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো।

২০০৫ সাল, ফ্যাসীবিরোধী লড়াই এর ৬০ বছর— সত্য রায় এই বিষয় নিয়ে লিখলেন। রতন খাসনবিশ প্রয়াত অজিত নারায়ণ বসু-র স্মরণে এক মর্মস্পর্শী ব্যক্তিগত উপলব্ধি পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। নেপালের সংগ্রাম তীব্রতা পাচ্ছে— *অনীক* সতর্ক দৃষ্টি মেলে তার নির্যাস পাঠকদের দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। চীন নিয়ে একটি ক্ষুদ্র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো— প্রকাশিত হলো নেপাল নিয়েও। প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল নিয়ে প্রকাশিত হলো এক গুচ্ছ লেখা। জিন্না বিতর্কে *অনীক* অংশ নিলো। বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হলো 'জাতপাত ও ধর্মের রাজনীতি'। এডগার স্নো-র মৃত্যুতে আমাদের বাংলাদেশের বন্ধু তারেক লিখলেন এক ক্রোড়পত্র, 'এডগার স্নো : জেগে ওঠা মানুষের বার্তাবহ'।

২০০৬— উন্নয়ন-সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিচ্ছে বামফ্রন্টের নীতি হিসেবে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-এর নান্দীমুখ ঘটছে। অশোক মিত্র মশাই-এর উচ্চারণ, 'তিমিরবিনাশী না তিমিরবিলাসী?' সিঙ্গুরকাণ্ডের এক বছর আগেই প্রশ্ন তুললো *অনীক*— 'কোন্ পথে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন?' (দীপংকর চক্রবর্তী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০৬) মাওবাদী রাজনীতির 'অসারতা' প্রমাণের জন্য কলম ধরেছিলেন প্রয়াত সিপিআই-এম নেতা অনিল বিশ্বাস। *অনীক*-এর পাতায় সেই সমালোচনার অসারতাকে ছিন্নভিন্ন করলেন সুকান্ত রায়। এই বছরে বিভিন্ন নামে দীপংকরদা সমসাময়িক প্রায় সমস্ত ঘটনার ওপর মন্তব্য করে একগুচ্ছ ঘটনাপ্রবাহ রচনা করলেন। ঘটলো সিঙ্গুর। সম্পাদকের দায়িত্ব কাঁধে রেখেও দীপংকরদা রাস্তায় নামলেন, হেনস্থা হলেন বামফ্রন্টের পুলিশের হাতে। লিফলেট বার করা, বুদ্ধিজীবীদের একজোট করে বিবৃতি দেওয়া, এসব অব্যাহত রইলো। হয়ত এই অবিরত দৌড়ঝাঁপের ফলেই তাঁর পলকা ফুসফুস মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ ঘোষণা করত। সক্রিয়তা, তারপর অবধারিত গলা ভেঙে যাওয়া, মৃদু থেকে তীব্র জ্বর, নিরাময়, আবার দুপুর রৌদ্রে মিছিলে সামিল।

তারেক আর গীতির আন্তরিক আহ্বানে আমি আর দীপংকরদা বাংলাদেশ রওয়ানা হলাম। দীপংকরদার ভিসা প্রস্তুত, ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা। কিন্তু আমার হলো ভিসা-বিভ্রাট। শেষে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রবেশের ভিসা পেলাম। রওয়ানা দিলাম।

ঢাকায় থাকাকালীন শহরের পরিচিত বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে দীপংকরদার মতবিনিময় একটি স্মরণীয় ঘটনা। দীপংকরদার উপস্থিতির খবর পেয়ে ঢাকার একটি পরিচিত টিভি চ্যানেল এক শুক্রবার বিকেলে দীপংকরদাকে 'বিকেলের অতিথি' অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলো। ফেরার পথেও বিচিত্র সব ঘটনা ঘটলো— ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থলে দীপংকরদা।

২০০৬-তে সিঙ্গুর নিয়ে ডিসেম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সংখ্যাটি এত দ্রুত বিক্রি হয়ে যায় যে একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা ভাবা হলো, কিন্তু ঘটনা এত দ্রুত বাঁক নিচ্ছিলো যে আপাতত সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো।

২০০৭-এ এসে গেলো নন্দীগ্রাম কাণ্ড। মিছিলে দীপংকরদা সামিল। সারাদিন ফোন আর ছোটাছুটি। বিবৃতি প্রস্তুত করা, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের জন্য সারাদিন বন্ধুদের কাছে বারে বারে যাওয়া। তখন দীপংকরদাকে দেখে মনে হচ্ছে যে বয়স নির্ণায়ক যে সংখ্যাটি রয়েছে, তার থেকে বুঝি ১০ বছর বিয়োগ হয়ে গেছে। ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি চূড়ান্ত হচ্ছে। *অনীক* যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব তুলে তার বিরোধিতায় সরব। দীপংকরদা লিখলেন 'মার্কসবাদের আলোকে পুঁজিবাদের বর্তমান সংকট'। 'সেজ' নিয়ে সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

২০০৮-এর বইমেলা। দীপ্তি চন্দ বইমেলার কিস্‌সা নিয়ে এক তীব্র লেখা পত্রস্থ করলেন। *অনীক*-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো 'নাগরিক সমাজ' নিয়ে। তসলিমা নিয়ে শহর উত্তপ্ত, বামপন্থী নেতা দূরদর্শনে ক্যামেরার সামনে বলছেন, তসলিমার জন্য কলকাতার শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে— তসলিমা

বাংলা ছাড়ুন। দীপংকরদা এই বিষয় নিয়ে লিখলেন, ‘প্রসঙ্গ : তসলিমা’। মে সংখ্যায় দীপংকরদা লিখলেন, ‘প্রসঙ্গ : নেপাল’। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৮-এ প্রকাশিত হলো ‘বিশ্বায়ন ও ভারতের অর্থনীতি’ বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় অসুস্থ শরীর নিয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করে দীপংকরদা লিখলেন, ‘পুঁজিবাদ নির্মাণ ও পশ্চিমবঙ্গ’।

লালগড়ে পুলিশি অত্যাচার সব মাত্রা ছাড়িয়েছে। লালগড়ের ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক লেখা ছাপা হলো অনীক-এ। ২০০৯-এ *অনীক* প্রকাশ করলো পরিবেশ নিয়ে এবং পুঁজিবাদী বিশ্বের সংকট নিয়ে দুটি বিশেষ সংখ্যা। পুঁজির আগ্রাসন নিয়ে দীপংকরদার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো।

দীপংকরদার সজাগ মননে আন্তর্জাতিক প্রায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ধরা না পড়ে পারত না। সবার অলক্ষ্যে যে বার্লিন প্রাচীর ধ্বংস-র দু দশক অতিক্রান্ত, সে বিষয়ে খেয়াল করে বইমেলাতে প্রকাশিত হলো বার্লিন প্রাচীরের পতন, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র নিয়ে একগুচ্ছ লেখার সমাহারে বিশেষ সংখ্যা। দীপংকরদা লিখলেন ‘বার্লিন প্রাচীর, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সমস্যা’। ইউএপিএ-তে গ্রেপ্তার করার পর সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রয়াত হন *পিপলস মার্চ* পত্রিকার সম্পাদক শ্রী স্বপন দাসগুপ্ত। তাঁকে ইউএপিএ-র প্রথম শহীদ হিসেবে বর্ণনা করে এক আদ্যন্ত রাজনৈতিক লেখা লিখলেন দীপংকরদা। এ প্রসঙ্গে আমরা আবার দুর্গা বাস্কের ঘটনা স্মরণে আনতে পারি ও সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসি জমানায় ঘটে যাওয়া জেলের ভেতরে-বাইরে অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে *অনীক*-এর দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি।

ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে যে অবস্থান থেকে ক্রমশ সরে এসেছে সিপিআই-এম, সেই অবস্থানে যুক্তি-তথ্য-তত্ত্ব-র ভিত্তিতে অনড় দীপংকরদা নতুন প্রজন্মের কাছে বিতর্কের মূল ইস্যুগুলি তুলে ধরে এক অসাধারণ প্রবন্ধ রচনা করলেন : ‘প্রসঙ্গ : ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ’। সোভিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রটি ঠিক কী ছিলো তার এক অন্তর্তদন্ত মূলক সংখ্যা প্রকাশিত হলো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০-এ। এই সংখ্যায় দীপংকরদা স্তালিন-বিরোধী কুৎসার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন। বিভাস চক্রবর্তীর নাটকের সমালোচনাও লিখলেন মে সংখ্যাতে।

২০১১-তে বইমেলাতে প্রকাশিত হলো ‘পরিবর্তন’ সংখ্যা। নানান কারণে, সবটা আমাদের নিয়ন্ত্রণেও ছিলো না, সংখ্যাটা বইমেলাতে পৌঁছোলো একটু দেরি করে। ইতিমধ্যে দীপংকরদার ফুসফুসের রোগ একটু বেশি চেপে ধরেছে। আমরা কড়া ‘নির্দেশ’ জারি করে দীপংকরদাকে ধুলোর জন্য বইমেলায় আসা আটকে রেখেছি। কিন্তু শেষ দুটো দিন দীপংকরদা হাজির, এবং শেষ পর্যন্ত থেকে পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে হৈ চৈ করে সময় কাটালেন। এই বছর ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ‘পরিবর্তন’ ঘটছে— বামফ্রন্ট-এর বিরোধী সবাইকেই বামফ্রন্ট নির্বিশেষে ঘাসফুলপন্থী বলে গাল পাড়ছে। সমাজের অতি ঘনিষ্ঠজনেরাও মাঝে মাঝে *অনীক*-এর মধ্যে ঘাসফুল সমর্থনের ছায়া দেখছেন। যে অসীম সাহসে এবং রাজনৈতিক বীক্ষা, ধীশক্তি এবং পরিণত বোধ নিয়ে সত্তর দশকের উত্তাল দিনগুলিতে ‘খতম’, ‘গণলাইন’ বর্জন নিয়ে অন্দরমহলের মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে *অনীক* এবং দীপংকরদা এই দুই বিধ্বংসী রাজনীতির বিরোধিতা করেছিলেন, সেই একই বোধ *অনীক* এবং দীপংকরদাকে তাড়িত করেছিলো ‘মাওবাদী’দের নতুন প্রেক্ষিতে ‘খতম’ লাইনের রাজনীতির বিরোধিতায়। বাম রাজনীতির শুদ্ধতা এবং প্রাসঙ্গিকতা-তাড়িত হয়ে বামেদের দক্ষিণপথের পথিক হওয়া এবং দক্ষিণপন্থার পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে আবার কলম ধরলেন দীপংকরদা। দক্ষিণ পথের পথিক বামেরা *অনীক* তথা সম্পাদককে ‘বাম-বিরোধী’ তক্‌মা দিলো, কিছু বামপন্থীর ধারণা হলো তৃণমূলের উত্থানের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উৎস সন্ধান করে *অনীক* বুঝি প্রত্যাখ্যাত বামেদের জন্য পরিসর নির্মাণ করছে! এই বিতর্ক আজও জারি আছে— *অনীক*-এর অনুশীলন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর বিস্তার— এই দুই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভুল-ঠিক নির্ধারিত হবে। এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে প্রকাশিত হলো ২০১১-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ‘ভারতে মাওবাদ’ সংখ্যা। এই বছর বেনামে-স্বনামে দীপংকরদা লিখলেন নয়-নয় করে ২২টি লেখা। গড়ে সংখ্যা পিছু দুটি করে লেখা। অসুস্থ হওয়াও ঘটছে বারবার। জ্বর আসে, গলা ভেঙে যায়। আবার চাঙ্গা হয়ে বিপুল উৎসাহে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পল সুইজির কয়েকটা অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন সম্পাদনা করলেন। অধুনালুপ্ত এবং দুষ্প্রাপ্য ‘কালপুরুষ’ পত্রিকার সংকলন সম্পাদনা করলেন। উদয়নদার মৃত্যুর পর তাঁর গল্পের একটি ছোটো সংকলন প্রকাশ করলেন। ফাঁকে ফাঁকে চললো *অনীক*-এর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কী কী করা যায় তার প্রস্তুতি।

২০১২-তে একবার হাসপাতাল ঘুরে এলেন কিছুদিন। বাড়িতে নেবুলাইজার। নিয়ম-অনিয়ম নিয়ে জীবন চলছে। নোনাডাঙ্গা-র আন্দোলন নিয়ে বিবৃতি তৈরির জন্য খানিকটা ছুটোছুটি, খানিকটা টেলিফোনে সংগঠিত করছেন। প্রায় অবিরাম লেখা চলছে। চলছে *অনীক*-এর পঞ্চাশ বছর ঘিরে পরিকল্পনা। জ্বরে বাড়িতে থাকতে থাকতে *অনীক* পঞ্চাশ বছরের প্রথম খন্ডের সম্ভাব্য লেখাপত্রর তালিকা একদিন ই-মেল করে পাঠিয়ে দিলেন। ভারত-চীন সীমানা বিরোধ নিয়ে প্রকাশিত নতুন তথ্যের ব্যবহার করে আবার দুটি বড় লেখা তৈরি করলেন।

২০১২। মা-মাটি-গণতন্ত্রের গণপ্রহার রূপে আবির্ভাব। *অনীক* দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো। একটি কৃষির চরিত্র বিষয়ক, অন্যটি বিশ্বায়নের দুই দশক। বাথানিটোলার রায়, ইজরায়েলের নয়া আগ্রাসন নিয়ে দীপংকরদা বড় লেখা লিখলেন।

কীসের টানে *অনীক*-এর পাশে জড়ো হতেন, হয়েছেন এবং হচ্ছেন কিছু মানুষ? পাঠক খোঁজ করেছেন সম্পাদকের, সম্পাদক খোঁজ করে তৈরি করেছেন ভবিষ্যতের লেখককে? সেটা সম্ভবত সম্পাদকের ব্যক্তিগত দুরন্ত আকর্ষণ ও তাঁর প্রজ্ঞা। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে হেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই যা *অনীক*-এ স্থান পায়নি। গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের বিশেষ সংখ্যাগুলোর পরিকল্পনায় সেই রাজনৈতিক ধী-র সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলার রেনেসাঁস, অগ্নিযুগ, বঙ্কিম সংখ্যা হয়েছে। কংগ্রেস শতবর্ষ ও ভারত ছাড়ো-র অর্ধশতক থেকে মাও, স্তালিন, হেমাঙ্গ-সমর-বীরেণ চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা। আবার সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংখ্যা, কৃষির চরিত্র, সশস্ত্র বিপ্লব, বিশ্বায়ন, প্রতিরোধ, তেভাগা বা নকশালবাড়ি সংখ্যা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বামফ্রন্টের নানা দিক নিয়ে আলোচনার বেশ ক'টি সংখ্যা, কানোরিয়া সংখ্যা। সমসাময়িক বিষয় ধরলে পূর্ববাংলা সংখ্যা, দলিত সংখ্যা, গৈরিক ফ্যাসিবাদ, নন্দীগ্রাম, *সেজ*, পরিবর্তন, নাগরিক সমাজ বিষয়ক সংখ্যা। পরিবেশ আন্দোলনের তাত্ত্বিক আলোচনা সমৃদ্ধ সংখ্যার কথাও বলা দরকার।

সবুজপত্র বা *পরিচয়*-এর 'আড্ডা' নিয়ে অনেক স্মৃতিচারণ রয়েছে। হিরণ সান্ন্যাল বা শ্যামল ঘোষের মতো কোনো উদ্যোগী এবং সুস্থিত মানুষ *অনীক* দপ্তরের প্রাণচঞ্চল আড্ডাগুলোর নির্যাস ধরে রাখেন নি। বস্তুত যে আবহাওয়ায় *অনীক*-এর *অনীক* হয়ে ওঠা, সেখানে ইতিহাস সংরক্ষণের এইসব পদক্ষেপ কিছুটা অভাবিত ছিল, হয়ত শোভনও হতো না। কোনো কথাকার বা লিপিকার না থাকায় *পুনশ্চ-অনীকের* অনেক কথাই অজ্ঞাত থেকে যাবে। হারিয়ে গেছে, অন্তত আপাতত, সেই সব স্মৃতি, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসের এক ঘনীকৃত চুম্বকের।

শেষের সে দিনের ন্যূনতম পূর্বাভাসও ছিল না। এটা ঠিকই যে প্রায় একমাস ভুগছিলেন শ্বাসকষ্টে। একদিন আমি আর সুমিতা প্রবলভাবে শাসন করায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আপৎকালীন ফুসফুস চিকিৎসায় নিমরাজি হলেন। এদিকে বইমেলা সমাগত। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'আক্রান্ত মানুষ' নিয়ে উনি রীতিমতো চিন্তিত। প্রত্যাশিত কয়েকটি বড় লেখা সময়মতো জমা পড়েনি। তিনি চীন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে একটা নতুন লেখা শুরু করলেন। এক মঙ্গলবার অনীক দপ্তরে এলেন। আগের সেই ম্রিয়মান, শরীর নিয়ে কাতর দীপংকরদা একেবারে পরিবর্তিত। সজীব, তরতাজা, ঝকঝকে। পিবিএস থেকে চীন সম্পর্কিত (দীপংকরদা সম্পাদিত) প্রকাশিতব্য বইটির খসড়া পেশ করে অনুবাদের দায়িত্ব বণ্টন করলেন। সেই সূত্রে একদিন সকালে দীপংকরদার বাড়ি গিয়ে দেখি সামান্য জ্বর, গলা ভাঙা, কিন্তু শোবার ঘরের এক চিলতে রোদ্দুরের দিকে বসে চীন সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। মঙ্গলবার বাদ দিয়ে শুক্রবার এলেন— নিরাময়ের স্পষ্ট চিহ্ন নিয়ে। কর্মসূত্রে আমাকে রাজধানী পাড়ি দিতে হলো।

তার পর দিন ২৭ জানুয়ারির কালরাত্রিতে প্রশান্তদা ফোনে খবর দিলেন। দীপংকরদা আর নেই। মফস্বল শহরের কূপমণ্ডুকতা অতিক্রম করে, আক্ষরিক অর্থেই নাগরিক মানসিকতার যে আন্তর্জাতিক নাগরিকটি দুর্দান্ত সাতটি দশক অতিক্রম করে সাম্য-মৈত্রী-সমাজতন্ত্রের সন্ধানে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন, পরের দিন একরাশ রৌদ্রের মাঝে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত-এর ঝংকারে তাঁর মৃতদেহ বহন করে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে দান করা হলো। তাঁর আগেই দীপুদার সেই সদা-কৌতূহলী চোখ দুটো কোনো এক চক্ষুহীন ব্যক্তির জন্যও দান সম্পন্ন হয়েছে।

সুকুমার রায় সমগ্র সম্পাদনা করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন যে সুকুমার রায় তাঁর 'ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর' কবিতার মাধ্যমে মৃত্যু নিয়ে উপহাস করতেও দ্বিধা করেননি— তাঁর মতে এই বিষয়টি নিয়ে আর কে কী লিখেছেন তা তিনি জানেন না। আমরা, যারা দীপংকরদার কাছ থেকে প্রায় নিয়মিত মজার মজার এসএমএস পেতাম, তারা জানি। তাঁর সত্তরতম জন্মদিনের সকালে আমরা ক'জন একটি এসএমএস পাই:

ভাবলাম এই মাত্তর
পার হলাম তো সত্তর
ঘনিয়ে আসে বাহাত্তর
গুটিয়ে খাতা পত্তর
সরে পড়ি সত্বর।

হার্টের রোগের পাশাপাশি দুরারোগ্য ফুসফুসের অসুখের রোগী দীপংকরদা প্রায়শই তাঁর ক্রমাগত কমজোরি হয়ে আসা শরীর নিয়ে নানান কথা বলতেন। অবসরগ্রহণের কথা, আবার তার সঙ্গে *অনীক*-এর অর্ধশতক পূর্তি নিয়ে উৎসাহভরে কথা চালানো— দুটোই চলত সমান তালে। খাতাপত্তর গোটানোর হুমকি দিলেও তাঁর প্রাণভোমরা খাতাপত্তরই ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। জন্মদিনে মৃত্যু নিয়ে পরিহাস, বিদায়বেলার বেদনাকে তুচ্ছতায় পরিণত করতে দীপংকরদার মতো কাউকে দেখিনি।

যে অভূতপূর্ব সহমর্মিতায় নাগরিক অধিকার রক্ষা কর্মী, শিল্পী-সাহিত্যক এবং রাজনৈতিক কর্মীরা আত্মীয়-বিয়োগে সমবেত হয়ে দীপংকরদাকে স্মরণ করলেন, বিবদমান এবং বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুরাও যেভাবে হাতে হাত রেখে স্মরণসভা এবং অন্যান্য স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তা আমৃত্যু স্মরণযোগ্য। দীপংকরদার জন্য অন্য কী-ই বা হতে পারত!

অনীক-এর পঞ্চাশ বছরে পদার্পণের মুহূর্তে দীপংকরদা নেই, কিন্তু তাঁর দিক্‌নির্দেশ *অনীক*-কে দিগভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখবে।